

নজরের হেফাজত করণ

মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ.

রোগ-ব্যধির দ্বারা তত ক্ষতি ও সর্বনাশ হয় না যত ক্ষতি ও সর্বনাশ হয় গোনাহ ও পাপাচার দ্বারা	2
রোগ-ব্যধি না থাকার দুটি পথ	2
হযরত আবু তালহা রাযি. এর ঘটনা	3
মৃত্যু মুমিনের তোহফা ও উপটৌকন	4
রুহের রোগ-ব্যধি দেহের রোগ-ব্যধি থেকে ভয়ঙ্কর	5
কুদৃষ্টি ও অসদুদ্দেশ্যকে মানুষ হালকা গোনাহ মনে করে	5
বড়দের পর্দাপুশি ও আড়াল করণ	6
কুদৃষ্টি ও বদ-নজরির ফলে চক্ষু বে-নূর হয়ে যায়	7
কুদৃষ্টি ও বদনজরী বড় সহজ	8
বদনজরী ও কুদৃষ্টির ব্যাপারে আমরা সতর্ক ও সাবধান নই	9
এক সুশ্রী ছেলের উপর এক আবেদের দৃষ্টিপাতের গল্প	11
ইশকে মাজযি তথা ‘পার্শ্ব-প্রণয়’ এর নির্দেশের অর্থ	11
মহিষের ধ্যান করার নির্দেশ প্রদান	13
গায়রুল্লাহর প্রতি দৃষ্টিপাত করা বড় মারাত্মক গোনাহ	15
পর্দার ব্যাপারে শিখিল ও অসতর্ক এক বুয়ুর্গের ঘটনা	16
মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ. এর ঘটনা	17
নারীদের মধ্যেও নজরবাযি ও কুদৃষ্টির রোগ রয়েছে	18
নজরবাযি ও কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার সহজ পথ	19
জনৈক বুয়ুর্গের পুরুষদের প্রতি না তাকানোর ঘটনা	20
কুদৃষ্টির গোনাহ এড়ানোর জন্য কতক বুয়ুর্গ তো জনমানবহীন স্থানে বসবাসকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন	20
কিছু বুয়ুর্গ ও মহামানবের সৌন্দর্যপ্রেমী হওয়ার অর্থ ও মর্ম	20
হযরত মির্যা সাহেবের আরও কিছু ঘটনা গুনুন	21
জনৈক বুয়ুর্গের ঘটনা	22
আরেক বুয়ুর্গের ঘটনা	22
তোমাদের ঈমান নষ্ট করার সুযোগ গ্রহণ করে।	22
কুদৃষ্টি যেমন হারাম তদ্রূপ মনের কুচিন্তাও হারাম	23
মনের কামনা ও চাহিদা এবং জল্পনা ও কল্পনা দমন করার সহজ পথ	24
দ্বিতীয় স্তর : ভবিষ্যতেও এ ধরনের কামনা ও চাহিদা এবং জল্পনা-কল্পনা পয়দা না হওয়ার উপায়	25
কামনা ও বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।	26

আল্লাহ পাক বলেন- *يَعْلَمُ خَ حَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ*

আল্লাহ পাক চোখের খেয়ানত ও চোরাচাহনি সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং বক্ষ যা কিছু গোপন করে তা-ও জানেন। সূরা মুমিন : ১৯

এটি এমন একটি আয়াত যার শব্দ ও লফজ কম কিন্তু তার অর্থ ও মর্ম ব্যাপক বিস্তৃত। আল্লাহ পাক এই আয়াতে মানব চরিত্রের একটি খারাপ দিক উল্লেখ করেছেন এবং পাশাপাশি এর জন্য তিরস্কারও করেছেন। এই আয়াতে যে মন্দ ও খারাপ দিকটির কথা আলোচনা করা হয়েছে তাতে মানুষ ব্যাপকভাবে ফেঁসে আছে। এজন্য এই আয়াত সামনে রেখে আলোচনা করব। রোগ-ব্যাধির মধ্য থেকে ঐ রোগের ব্যাপারে মানুষকে বেশি সতর্ক ও সাবধান করা জরুরী যে রোগে মানুষ ব্যাপকভাবে আক্রান্ত। রোগ দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল গোনাহ।

রোগ-ব্যাধির দ্বারা তত ক্ষতি ও সর্বনাশ হয় না যত ক্ষতি ও সর্বনাশ হয় গোনাহ ও পাঁপাচার দ্বারা

মানুষ হয়ত আশ্চর্যবোধ করবে যে, গোনাহকে রোগ আখ্যায়িত করা হচ্ছে কেন, আসলে বিষয়টি হল- রোগ ও ব্যাধির দ্বারা যেমন ক্ষতি ও অনিষ্ট সাধিত হয় পাপ ও গোনাহ দ্বারাও তেমনি ক্ষতি ও অনিষ্ট সাধিত হয়; এমনকি পাপ ও গোনাহ দ্বারা যে ক্ষতি ও সর্বনাশ হয় তা বাহ্যিক রোগ-ব্যাধির ক্ষতি ও অনিষ্টের চেয়ে গুরুতর ও ভয়ঙ্কর। কারণ বাহ্যিক রোগ-ব্যাধিতে বড়জোর রোগীর মৃত্যু ঘটে, আর মৃত্যুতে তো অনেক সময় ক্ষতির চেয়ে লাভ বেশি হয়, মৃত্যুতে মানুষ বহু সঙ্কট ও বেড়াঁজাল থেকে মুক্তি লাভ করে, যত কষ্ট ও যন্ত্রণা পোহাতে হয় তার সবই কেবল এই আত্মা ও দেহের সংযোগ অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত। দেখুন, যে দেহ অবশ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় তা কেটে ফেললেও কোন কষ্ট হয় না। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর কথাই ধরুন, তার দেহের যতখানি অংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত ততখানি অংশে যদি সুঁইও ফোটানো হয় তবুও কোন কষ্ট হয় না। কারণ, দেহ ও আত্মার যে গভীর সম্বন্ধ ছিল তা বর্তমানে সেখানে ততটা নেই। তাই আর ব্যথা-বেদনা অনুভূত হয় না।

রোগ-ব্যাধি না থাকার দুটি পথ

জৈনিক ভদ্রলোক এক চিকিৎসকের প্রশংসা করে বলল- ইনি বড় বিজ্ঞ (!) চিকি, তার চিকিৎসায় কোন রোগই আর থাকে না অর্থাৎ তার চিকিৎসায় কোন রোগীই বাঁচে না! তাই রোগ থাকবে কোথেকে? তো এক পথ হল- রোগী বেঁচে থাকবে আর রোগ সেরে যাবে। আরেক পথ হল- রোগীই চির বিদায় গ্রহণ করবে। যেমন এক নেশাখোরের নাকে একটি মাছি এসে বসল। সে তাকে তাড়িয়ে দিল। মাছি পুনরায় এসে বসল, সে তাড়িয়ে দিল। বারবার তাড়িয়ে দেওয়ার পরও যখন মাছি যাচ্ছিল না তখন সে বিরক্ত হয়ে ছুড়ি দিয়ে নাকই কেটে ফেলে দিল! আর বিড় বিড় করে বলতে লাগল- যাও এখন আর কোথায় বসবে, যেখানে বসতে সে স্থানই আর নেই!

মোটকথা যখন মানুষ মরে যায় তখন আর কোন রোগ-বালাই থাকে না। সর্দি-ঠাঞ্জ কাশি জ্বর কিছুই থাকে না এবং কোন পেরেশানী ও দুশ্চিন্তাও থাকে না। সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায়। পূর্ণ আরাম ও শান্তি লাভ হয়।

হযরত আবু তালহা রাযি. এর ঘটনা

‘আরাম’ শব্দটির আলোচনা আসায় এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ল। হাদীস শরীফে আবু তালহা রাযি. এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে সুলাইম রাযি. এর অনেক প্রশংসা করা হয়েছে। একদা তাদের একটি শিশুপুত্র অসুস্থ হয়ে পড়ল। হযরত আবু তালহা রাযি. বাইর থেকে যখনই ঘরে ফিরতেন তখনই স্ত্রীকে তার কথা জিজ্ঞেস করতেন, তার খোঁজ নিতেন। শিশুপুত্রটি অসুস্থ অবস্থায় একদিন ইস্তেকাল করল। তখন হযরত আবু তালহা রাযি. বাইরে ছিলেন। সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরলেন তখন স্ত্রী উম্মে সুলাইম রাযি. ভাবলেন- এ মুহূর্তে বিষয়টি প্রকাশ করলে সারা দিনের কর্মক্লাস্তির পর আর খাবার গ্রহণ করতে পারবেন না এবং ঘুমুতেও পারবেন না। অহেতুক অস্থির ও বেচাইন হবেন। তাই এ মুহূর্তে বিষয়টি প্রকাশ না করাই ভাল হবে। হযরত আবু তালহা রাযি. যখন অভ্যাস অনুযায়ী জিজ্ঞেস করলেন- ওর অবস্থা এখন কেমন? এ সময়টি বড় কঠিন পরীক্ষার ছিল, কারণ সত্য বললে মাসলেহাত ও পরিস্থিতির দাবী উপেক্ষিত হবে, আর মিথ্যা বললে বড় গোনাহ হবে। বাস্তবেই তখন তার উত্তর দিতে ভীষণ কষ্ট হয়েছে কিন্তু দীনদারী এমন মহামূল্যবান সম্পদ যে, তা বিচার-বুদ্ধিকে আরও তীক্ষ্ণ ও শানিত করে তোলে। তো আল্লাহ তাআলা তার মাথায় উত্তর ঢেলে দিলেন। তিনি বললেন- এখন তো সে আরাম ও শান্তিতে আছে। কারণ, মৃত্যুর চেয়ে আরাম ও শান্তিপ্রদ আর কী হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে একটি চমকপ্রদ গল্প মনে পড়ল। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমার মহান পিতা হযরত আব্বাস রাযি. এর যখন ইস্তেকাল হল তখন এক বেদুঈন আমাকে যে ভাষায় সান্ত্বনা দিয়েছিল তেমন করে আর কেউ আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারেনি। সত্যিই দীনদার চাই সে শহুরে হোক কিংবা গ্রামীণ, স্বাক্ষর হোক কিংবা নিরক্ষর তার বোধ-বুদ্ধি এবং চিন্তা ও চেতনার অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। তাই সে যে কথা কথা বলে তা যথার্থ ও স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা মোতাবেক হয়। তো ঐ বেদুঈন তাকে সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানাতে গিয়ে বলল- আপনি ধৈর্য ধরুন, আমরা আপনাকে দেখে ধৈর্য ধারণ করব। কারণ, (জ্ঞান, গুণ ও যোগ্যতায়) আপনি আমাদের বড় ও মাননীয়, আমরা আপনার ছোট ও অনুগামী। ছোটদের ছবর বড়দের ছবরের পর হয়ে থাকে (যখন বড়রা ছবর করে তখন ছোটরাও ছবর করে) আপনার পিতার ইস্তেকালে আপনার কোন ক্ষতি হয়নি; বরং লাভ হয়েছে। কারণ এতে আপনি যে আঘাত পেয়েছেন তাতে আপনার ছাওয়াব হয়েছে। এই ছাওয়াব আপনার জন্য আপনার পিতা আব্বাসের চেয়ে উত্তম। আর এতে আপনার পিতারও কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ তিনি আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছেন। আর আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য হযরত আব্বাসের জন্য আপনাদের চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ আপনাদের সাহচর্যে

থাকার চেয়ে আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে থাকা বেশি ভাল। বাস্তবেই এ বেদুঈন বড় চমৎকার কথা বলেছে।

মৃত্যু মুমিনের তোহফা ও উপটোকন

বাস্তবেই মৃত্যু এতটাই আরাম ও শান্তিদায়ক বস্তু যে, হাদীসের ভাষায় একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে- ‘মৃত্যু মুমিনের তোহফা ও উপটোকন’ অথচ মানুষের অবস্থা হল মানুষ এর থেকে পালিয়ে বেড়ায়। কারণ, মানুষ ঐ জগত দেখেনি। মৃত্যু একটি রেলগাড়ির মত, রেলগাড়ি যেমন মানুষকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে দেয় তেমনি মৃত্যু মানুষকে ইহজগত থেকে পরজগতে পৌঁছে দেয়। মানুষ যখন রেলগাড়িতে বসে থাকে তখন তার কোন খবর থাকে না যে, তার গন্তব্যস্থলে তার জন্য কি কি জিনিস প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। গাড়ি থেকে গন্তব্যস্থলে নেমে দেখতে পায় যে, তার জন্য রকমারি বস্তুর সম্ভার থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তাকে গ্রহণ করার জন্য কতজন অপেক্ষা করছে। পানাহারের জন্য হরেক রকমের উপাদেয় বস্তু প্রস্তুত করে রাখা আছে। এসব দেখে সে মনে মনে বলে আল্লাহ্ আকবার! এখানে দেখি আমার জন্য কত রকমের নায-নেয়ামতের আসবাব ও উপকরণ অপেক্ষা করছে। আর যেখান থেকে সে আগমন করেছে সেখানের সবকিছু তার কাছে অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। এমনকি ঐসবের কথা আর তার মনেও পড়ে না। ঠিক তদ্রূপ দুনিয়ার অবস্থা, এখন আমরা এখানে অবস্থান করা অবস্থায় ওখানকার কোন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছব, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে দেখতে পাব আমাদের জন্য কত নায-নেয়ামত অপেক্ষা করছে, যার সম্মুখে দুনিয়ার নায-নেয়ামত ও ভোগসামগ্রী অতি তুচ্ছ ও নগণ্য মনে হবে। আল্লাহর অলি ও বুয়ুর্গগণ যেহেতু দিব্য দৃষ্টি কিংবা অন্তদৃষ্টি দ্বারা সেখানকার অভাবনীয় নায-নেয়ামতের দর্শন লাভ করেছেন তাই দুনিয়ার নায-নেয়ামতের জৌলুস ও চাকচিক্য তাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত হয়ে ও তুচ্ছ। দুনিয়া আখেরাতের তুলনায় এতটাই ছোট যেমন দুনিয়ার তুলনায় মাতৃগর্ভ ছোট। ছোট শিশু যেমন মাতৃগর্ভ ছেড়ে খুশি খুশি দুনিয়ায় আসতে চায় না, তদ্রূপ মানুষও স্বেচ্ছায় দুনিয়া ছেড়ে পরকালে যেতে চায় না। ছোট শিশু যেমন মাতৃগর্ভকে মনে করে যে, এটাই তামাম জাহান। কারণ এর বাইরে সে আর কিছু দেখতে পায় না। কিন্তু মাতৃগর্ভ থেকে যখন দুনিয়ায় আগমন করে তখন সে এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে যে, দুনিয়ার সম্মুখে মাতৃগর্ভ কিছুই না। তদ্রূপ আমরা যখন এই জগত থেকে প্রস্থান করে সেই জগতে পৌঁছব তখন এই জগতের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারব।

মোটকথা মৃত্যু হল পরিপূর্ণ শান্তি ও আরামের উপাদান, এ কারণেই হযরত উম্মে সুলাইম রাযি. বলেছেন- এখন সে আরামে আছে। এরপর হযরত আবু তালহা রাযি. খানা খেলেন এবং স্ত্রী-মিলন সেরে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্ত্রীর বাহ্যিক অবস্থা তো ছিল এই যে, স্বামীর খুশীর জন্য উপরে উপরে সবই করছিলেন কিন্তু ভেতরে যে কেমন তোলপাড় চলছিল তার অবস্থা কেবল আল্লাহ পাকই জানেন। মোটকথা স্বামী তো

প্রয়োজন সেরে নিশ্চিত্তে ঘুমিয়ে পড়লেন কিন্তু স্ত্রীর দু' চোখে ঘুমের দেখা মিলবে কোথেকে।

ভোরবেলা হযরত আবু তালহা রাযি. যখন ফজর নামায আদায় করে ঘরে ফিরলেন তখন স্ত্রী তাঁকে প্রশ্ন করলেন- বলুন দেখি, কেউ যদি কারো কাছে কোন কিছু আমানত রাখে এবং কিছুকাল পর সে আমানত ফেরত নিতে চায় তখন তার করণীয় কী? আমানতদার সানন্দে হাসিমুখে আমানত ফেরত দেওয়া, না আমানত চাওয়ার অপরাধে তার প্রতি রুষ্ট ও বেজার হওয়া? তিনি উত্তর দিলেন- সানন্দে হাসিমুখে আমানত ফেরত দেওয়া। এই ভ,মিকার পর তিনি আসল ঘটনা প্রকাশ করলেন- আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে রাখা তাঁর আমানত ফেরত নিয়ে গেছেন! এতে স্বামী কিছুটা নারাজ হয়ে অনুঃযোগের স্বরে বললেন- একথা আমাকে রাতে কেন বললে না। স্ত্রী বললেন- এতে কী লাভ হত, অহেতুক আপনার কষ্ট হত, নিদ্রার ব্যঘাত ঘটত। তিনি তো 'মৃত্যু'কে 'আরাম' আখ্যায়িত করেছেন, তাই এ প্রেক্ষিতে আমার এ ঘটনা মনে পড়েছে।

রুহের রোগ-ব্যাধি দেহের রোগ-ব্যাধি থেকে ভয়ঙ্কর

শারীরিক রোগ-ব্যাধির ক্ষতি বেশির চেয়ে বেশি মৃত্যু। আর মৃত্যুতে যেহেতু সমস্ত কষ্ট-ক্লেশ দূর হয়ে যায় তাই তা কোনক্রমেই মন্দ ও অপ্ৰিয় বস্তু নয়। কিন্তু তারপরও শারীরিক রোগ-ব্যাধির ব্যাপারে এতটাই সতর্কতা অবলম্বন করা হয় যে, এর কোন সীমা ও পরিসীমা নেই। কিন্তু রুহের ব্যাধি অর্থাৎ গোনাহ, এটা মানুষের এমন সর্বনাশ করে ছাড়ে যে, সে না মৃত্যুবরণ করে আর না জীবন্ত থাকে, অর্থাৎ তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। সেখানে যদি মৃত্যু হয়ে যেত তাহলে তো কিসসাই খতম ছিল। কিন্তু সেখানে তো তাও নেই। এজন্য এর রোগ-ব্যাধির ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের অবস্থা তো হল এই- সামান্য ঠাণ্ডা সর্দি হলেই আমরা চিকিৎসকের পেছনে পেছনে ঘুরতে থাকি পক্ষান্তরে রুহের হাজারো রোগ-ব্যাধি হলেও তার প্রতি কোন ভ্রঙ্ক্ষেপই করি না। এমনি তো সকল গোনাহ থেকেই সযত্ন দূরত্ব অবলম্বন করা উচিত, তবে যে গোনাহ ক্ষুদ্র ও হালকা মনে করা হয়, তা থেকে আরো বেশি সতর্ক থাকা উচিত।

জনৈক ব্যক্তি একদা ডাক্তারকে প্রশ্ন করেছিল- সবচেয়ে মারাত্মক রোগ কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন- যে রোগকে সাধারণ ও হালকা মনে করা হয়। এর কারণ হল- যখন কোন রোগ বা গোনাহকে হালকা ও সাধারণ মনে করা হয় তখন তার আর কোন এলাজ ও প্রতিষেধক থাকে না।

কুদৃষ্টি ও অসদুদ্দেশ্যকে মানুষ হালকা গোনাহ মনে করে

আলোচনার শুরুতে পঠিত আয়াতে দুটি গোনাহের কথা আলোচনা করা হয়েছে। একটি চোখের গোনাহ। আরেকটি দিলের গোনাহ। এমনি তো চোখের অনেক গোনাহ আছে কিন্তু পঠিত আয়াতে একটি বিশেষ গোনাহের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তা

হল কুদৃষ্টি ও বদনজর। তদ্রূপ দিলেরও রয়েছে বহু গোনাহ কিন্তু এখানে বিশেষ একটি গোনাহের কথা আলোচনা করা হয়েছে তা হল অসদুদ্দেশ্য ও খারাপ নিয়ত। এ দুইটাকে মানুষ গোনাহ মনে করে থাকে ঠিক, তবে এক্ষেত্রে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা যতটা ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক তাকে ততটা ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক মনে করে না। দেখুন গোনাহ হয়ে যাওয়ার পর এর নূন্যতম প্রতিক্রিয়া হল অন্তর ব্যথিত হওয়া কিন্তু এই গোনাহের পর অন্তর ব্যথিত হয় না। এই দুই গোনাহকে মানুষ একেবারে মামুলি মনে করে। কোন নারী কিংবা সুশ্রী বালককে দেখা সুন্দর কোন বাড়ি দেখার মতই মনে করে। আর এটা এমন গোনাহ যে, এর থেকে বৃদ্ধ ও বয়স্ক লোকেরা পর্যন্ত মুক্ত নয়। অপকর্ম ও ব্যাভিচার থেকে অনেকেই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। কারণ, এর জন্য অনেক তদবীর ও কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যার সঙ্গে ‘কার্য-সম্পাদন’ হবে তারও রাজি হওয়ার ব্যাপার আছে। হাতে যথেষ্ট অর্থকড়িও থাকা লাগে। তদুপরি তাকে চূড়ান্ত পর্যায়ের বেহায়া ও নির্লজ্জ হতে হয় তারপর গিয়ে সে আপন অপকর্ম সম্পাদন করতে পারে। এছাড়া তা সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আর কেউ তো এহেন কাজ থেকে এজন্য দূরে থাকে যে, যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে কান কাটা যাবে, সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। আর কেউ এ কারণে দূরে থাকে যে, না জানি কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। কেউ পারে না হাতে অর্থ না থাকায়, আর কেউ পারে না মান-ইজ্জতের ভয়ে। এ ধরনের বিভিন্ন কারণে ভদ্র মানুষ এহেন গর্হিত কাজ থেকে দূরে থাকে। বিশেষ করে যাদেরকে দ্বীনদার ও ধর্মপ্রাণ মনে করা হয় তারা এ ধরনের অন্যায় কাজে কম আক্রান্ত। পক্ষান্তরে চোখের গোনাহের জন্য এমন কোন কিছুই প্রয়োজন হয় না। কারণ, তাতে অর্থের প্রয়োজন হয় না এবং কলঙ্কেরও ভয় নেই। আর এক্ষেত্রে নিয়তের খবর তো একমাত্র আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। কারণ, কাউকে মন ভরে দেখে নিলেও কোন দ্বীনদারের দ্বীনদারিত্বে ক্ষতি হয় না। কোন নামাযীর নামাযী হওয়াতে কোন আচড় লাগে না। অন্যন্য গোনাহ তো মানুষ জানতে পারে কিন্তু এই গোনাহ তো মানুষ জানতেও পারে না। গোনাহ করতে থাকে অথচ সুনামও অব্যাহত থাকে। সুশ্রী বালক-বালিকাদের মন ভরে দেখে, অথচ মানুষ মনে করে তিনি শিশুদের খুব মহব্বত করেন। চোখের গোনাহই যখন মানুষ ধরতে পারে না তখন দিলের গোনাহের কথা কিভাবে টের পাবে।

বড়দের পর্দাপুশি ও আড়াল করণ

বড় যারা আছেন তাদের কেউ যদি ধরতেও পারেন যে, অমুকে কুদৃষ্টি ও বদনজরের গোনাহ করছে কিংবা কুমতলব এঁটেছে তাহলে তিনি এতটাই উদরতা দেখান যে, তার দোষ সংশোধন করার চেষ্টা করেন না, যা সঙ্গত নয়। এ প্রসঙ্গে হযরত উছমান রাযি. এর ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। একবার তাঁর মজলিসে এক ব্যক্তি এল, সে বদনজরীর কোন গোনাহ করে এসেছিল তখন হযরত উছমান রাযি. তার নাম তো উল্লেখ করেননি তবে এভাবে বলেছেন- লোকদের এ কী অবস্থা যে, তাদের চক্ষু থেকে যিনার কালিমা ঝরে। তো তিনি এমনভাবে বিষয়টি আলোচনা করলেন যে,

কারো মানহানিও হয়নি, আর যে এই কাজ করেছে সেও বুঝে নিয়েছে যে, আমাকে লক্ষ করেই বলা হয়েছে। যেসব বুয়ুর্গ গোপন বিষয়টি জানতে পারেন তারা মূলত ‘কাশফ’ এর অধিকারী হয়ে থাকেন আর এই কাশফের মাধ্যমেই তারা গোপন বিষয় জেনে থাকেন।

কুদৃষ্টি ও বদ-নজরির ফলে চক্ষু বে-নূর হয়ে যায়

কাশফ ও অন্তদৃষ্টির অধিকারী বুয়ুর্গগণ লিখেছেন- কুদৃষ্টি ও বদ-নজরির ফলে চোখে এতটা বে-রৌনকি ও অনুজ্জ্বলতা সৃষ্টি হয় যে, সামান্য বোধ ও বিবেচনার অধিকারী ব্যক্তিও বুঝতে পারবে যে, এ ব্যক্তির দৃষ্টি পবিত্র ও নিষ্কলুষ নয়। দুজন মানুষ যদি এমন হয় যে, তারা সমবয়সী, চেহারা-ছুরত এবং সৌন্দর্যও একই রকম আর পার্থক্য শুধু তাদের মধ্যে এটুকু যে, একজন গোনাহগার এবং আরেকজন দ্বীনদার, তাহলে আপনি নিজেই যখন ইচ্ছা পরখ করে নিতে পারবেন যে, দ্বীনদার ব্যক্তির চোখে এক ধরনের রৌনক, উজ্জ্বলতা ও সজীবতা বিরাজমান। আর গোনাহগার ব্যক্তির চোখে এক প্রকারের অনুজ্জ্বলতা, নিজীবতা ও নিষ্প্রভতা বিদ্যমান। যেসব বুয়ুর্গ এ ধরনের বিষয় ধরতে পারেন তারা কারো নাম প্রকাশ করে তাকে হয় ও অপদস্থ করেন না; বরং এ ধরনের দোষ গোপন রাখেন।

বুয়ুর্গদের মানব-দোষ আড়াল করণ এবং কৌশলে তা সংশোধন করার ঘটনা এ প্রসঙ্গে শাহ আব্দুল কাদের রহ. এর ঘটনা মনে পড়ল। শাহ সাহেব মসজিদে হাদীস শরীফের দরস দিতেন। প্রতিদিনের নিয়ম অনুযায়ী একবার মসজিদে দরস চলছিল। এক ছাত্র অনেকটা বিলম্ব করে দরসে হাজির হল। শাহ সাহেব কাশফের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, ছাত্রটির উপর গোসল ফরজ কিন্তু সে এখনও গোসল করে নি। শাহ সাহেব তাকে মসজিদের বাইরে থামিয়ে দিলেন এবং বললেন- আজ শরীরটা ভাল লাগছে না, চল সকলে মিলে যমুনা নদীতে গোসল করে আসি। লুঙ্গি ও জামা নিয়ে সকলেই যমুনা নদীতে গিয়ে ভালভাবে গোসল করল। গোসল করে ফিরে এসে শাহ সাহেব বললেন- সবক নাগা করা তো ঠিক নয় তাই আস কিছুটা পড়ে নেই। ঐ ছাত্রের তো লজ্জায় মাটিতে মিশে যাওয়ার অবস্থা। আল্লাহর অলি ও বুয়ুর্গগণই শুধু পারেন এমন সুন্দরভাবে অন্যের ত্রুটি সংশোধন করতে। কী চমৎকার পন্থায় তার গোসলের কাজ সমাধা করালেন। আল্লাহর অলি ও বুয়ুর্গদের এমন সুমহান চরিত্রের কথা জানার পর তাদের সহচর ও সম্পর্কীয়দের কর্তব্য হল, এমন মহান বুয়ুর্গদের থেকে নিজেদের দোষ-ত্রুটি গোপন না করা। এর কারণ হল- দোষ-ত্রুটি দুই কারণে গোপন রাখা হয়, এক. এ আশঙ্কায় যে, দোষ-ত্রুটি যার কাছে প্রকাশ করা হবে সে আমাকে তুচ্ছ ও হয় মনে করবে। তো এই মহামানবদের মধ্যে তো এই বিষয়টি নেই। কারণ, তারা নিজেকেই অন্য সবার চেয়ে হয় ও তুচ্ছ মনে করেন।

দুই. যার নিকট দোষ প্রকাশ করা হবে সে অন্যদের কাছে তা বলে বেড়াবে, তো এই মহান বুয়ুর্গদের মধ্যে এ বিষয়টিও নেই। তাই তাদের নিকট নির্দিধায় আপন দোষ-

ত্রুটি প্রকাশ করা উচিত, তবে তা হতে হবে এলাজ ও প্রতিকারের উদ্দেশ্যে, অযথা নয়। কারণ, বিনা প্রয়োজনে গোনাহ প্রকাশ করাও বড় গোনাহ। মোটকথা তারা এমন মানুষ যে, তাদের কাছে অন্যদের গোনাহ প্রকাশ পেয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা কাউকে অপদস্থ করেন না। আর যারা মানুষকে কোন দোষ-ত্রুটির কারণে অপদস্থ করে, তারা এ ধরনের বিষয় ধরতে পারে না। এজন্যই কুদৃষ্টি ও বদনজরীর গোনাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোপন ও অপ্রকাশিতই থেকে যায়। তাই অধিকাংশ মানুষই তা নির্দিধায় করে থাকে।

কুদৃষ্টি ও বদনজরী বড় সহজ

যিনা-ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদিতে তাকত ও শক্তির দরকার হয় কিন্তু কুদৃষ্টি ও বদনজরীতে তাও প্রয়োজন হয় না। তাইতো দেখা যায় অনেক মানুষ বৃদ্ধ ও বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও কুদৃষ্টির রোগে আক্রান্ত। লক্ষ করুন, কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি যদি কারো প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং কোন উপায়ে তাকে হাতের কাছে পেয়েও যায় তাহলে সে তার সঙ্গে কিছুই করতে পারবে না। কারণ, তার সেই শক্তিই নেই। কিন্তু কুদৃষ্টির ক্ষেত্রে এরও প্রয়োজন হয় না, এক পা কবরে চলে গেলেও তাতে কোন অসুবিধা হয় না। জনৈক দ্বীনদার বৃদ্ধ ব্যক্তি একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তখন তিনি আমাকে জানালেন যে, সুশ্রী বালকদের থেকে আমি আমার লুলোপ দৃষ্টি কিছুতেই সংবরণ করতে পারি না! বহুদিন থেকে এই রোগ আমার মধ্যে বিদ্যমান। আরেক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে এসে জানালেন- আমি সুন্দরী রূপসী নারী দেখলে চোখ ফেরাতে পারি না! এসব রোগ মূলত যৌবনের সূচনাকালে সৃষ্টি হয়; বরং বলা যায় সকল গোনাহেরই এই অবস্থা, তা নবযৌনের উন্মাদনায় করে ফেলা হয়, তারপর ঐ ব্যাধি ও মরয লেগে যায় এবং মৃত্যু পর্যন্ত আর পিছু ছাড়ে না। তবে যুবক আর বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য হল- যুবক এলাজ ও চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তা কারো কাছে প্রকাশ করে কিন্তু বৃদ্ধ ও বয়স্ক ব্যক্তি কারো কাছে তা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করে। তাই কারো কাছে মুখ খুলে না। তো বদনজরী ও অসদ্দেশ্য যেহেতু কারো কাছে প্রকাশ পায় না; বরং গোপন থাকে তাই বহু মানুষ এই ভয়ঙ্কর পাপে আক্রান্ত। আর একে তারা বড় গোনাহও মনে করে না। তাই এর থেকে বাঁচারও চেষ্টা করে না। আর এজন্যই আল্লাহ পাক দ্ব্যর্থহীনভাবে তাঁর কালামে বলেছেন- **يُعَلِّمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ**

আল্লাহ পাক চোখের খেয়ানত এবং বক্ষের গোপন বিষয়সমূহ জানেন। সূরা গাফের : ১৯ অর্থাৎ তোমরা যারা ভাবছ যে, আমাদের এই পাপের কথা কেউ জানে না, এটা আসলে তোমাদের বোকামি ও নির্বুদ্ধিতা, তোমাদের এই পাপ সম্পর্কে তো এমন মহাশক্তিদ্বার সত্তা অবগত যা তোমাদের উপর মারাত্মক গণ্যব ডেকে আনতে পারে। কারণ, তোমাদের এই পাপ সম্পর্কে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ অবগত আর তিনি তোমাদের উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাই তার শাস্তিকে অত্যন্ত ভয় করা

উচিত।

লক্ষ করুন, মানুষে দু' ধরনের হয়ে থাকে,
এক. যাদের কিছুটা লজ্জা ও চম্ফুলজ্জা আছে।
দুই. যাদের লজ্জা ও চম্ফুলজ্জা বলে কিছু নেই।

যাদের কিছুটা লজ্জা ও চম্ফুলজ্জা আছে তারা এতটুকুতেই ক্ষান্ত হয়ে যায় যে, আমার এই গর্হিত কাজ হয়ত কেউ জেনে যাবে। তো এ শ্রেণীর লোকদের গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমরা যে গোনাহ করছি তা আল্লাহ পাক জেনে যাবেন। তো যাদের কিছুটা লাজ-লজ্জা আছে তারা এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকে, যেন তাদের কোন দোষণীয় বিষয় অন্য কেউ জানতে না পারে। যদি সে বুঝতে পারে যে, আমার এই 'কাম' অন্য কেউ জেনে যাবে তাহলে সে তার ধারে কাছেও ঘেঁষে না। তো আল্লাহ তাআলা এ ধরনের লোকদেরকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য বলেছেন- দেখ, আল্লাহ তাআলা মানুষের বদ-নজরী ও অসদুদ্দেশ্য এবং কুদৃষ্টি ও কুতলব ধরে ফেলেন সুতরাং তাঁর লাজ রক্ষা করা উচিত। তার সামনে বেহায়া ও নির্লজ্জ হওয়া থেকে রিবত থাক। লাজ-লজ্জা আছে এমন লোকেরা এটুকুতেই ক্ষান্ত দেয়। আর যাদের হায়া-শরম বলতে কিছু নেই তারা কেউ জেনে ফেলতে পারে এ ধরনের কথায় ভয় পায় না; তারা কেবল 'জুতাপেটা' কে ভয় পায়।

এজন্য আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- একটু সামলে চলো, সাবধান থেকো, তোমাদের এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাপের কথাও আল্লাহ পাক জানেন যা দুনিয়ার কেউ জানে না, অর্থাৎ পরবর্তীতে দেখতে পাবে তোমাদেরকে কেমন 'জুতাপেটা' করা হয়, এখন থেকে যা করবে, একথা মনে রেখে করবে। তো আল্লাহ তাআলা উভয় শ্রেণীকেই সতর্ক করেছেন। লাজুক ও হায়া-শরমের অধিকারী লোকদেরকে এই বলে- তোমরা যা-ই কর তা আমি জানতে পারি সুতরাং আমার দিকে তাকিয়ে আমার লাজ রক্ষা করো। তো এই শ্রেণীভুক্তগণ লাজ রক্ষার খাতিরে এই ভেবেই ক্ষান্ত দেয় যে, যদি আমরা এহেন কাজ করি তাহলে তিনি ধরে ফেলবেন। আর বেহায়া ও নির্লজ্জ শ্রেণীর লোকেরা এই ভেবে বিরত থাকবে যে, যদি আমরা এহেন কাজ করতে থাকি তাহলে তিনি জেনে যাবেন এবং পরবর্তীতে 'জুতাপেটা' করবেন। মোটকথা উক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল- বদ-নজরী ও কুদৃষ্টির গোনাহ থেকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

বদনজরী ও কুদৃষ্টির ব্যাপারে আমরা সতর্ক ও সাবধান নই

এখন আমাদের একটু নিজের দিকে তাকানো উচিত। নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করা উচিত যে, আমরা এই ভয়ঙ্কর গোনাহ থেকে আত্মরক্ষায় কতটা সচেতন। আমার মনে হয়, সম্ভবত হাজারে এমন একজন পাওয়াও কঠিন হবে যে এই ভয়ঙ্কর গোনাহ থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকে, নতুবা ব্যাপকভাবে লোকজন এই ভয়াবহ গোনাহে আক্রান্ত হয়ে আছে এবং একে একেবারে হালকা ও সামান্য ভাবছে। যুবকদের তো কমপক্ষে

এতটুকু অনুভূতি আছে যে, আমরা কুদৃষ্টির গোনাহে আক্রান্ত কিন্তু যারা জোয়ানী পার হয়ে পৌঁছতে কিংবা বার্ষিক্যে পা রেখেছে তাদের এ অনুভূতিটুকু পর্যন্ত নেই যে, আমরা এই রোগে আক্রান্ত। তারা ভাবে আমাদের তো শাহওয়াত ও যৌনক্ষুধাই নেই তাই আমরা কাউকে দেখলে ক্ষতি কী! তো বোঝা গেল তাদের মধ্যে তাদের গোনাহের অনুভূতিটুকুও নেই।

সুন্দরন বালক ও আকর্ষণীয় নারী এবং সুন্দর ফুল ও দৃশ্যের দর্শন-পিপাসা এক নয় কিছু কিছু মানুষ এই ভেবে ধোকা ও প্রবঞ্চনার শিকার হয় যে, শয়তান তাদের কাছে এই বলে যুক্তি প্রদর্শন করে যে, সুন্দর ও সুন্দরীদের সরাসরি কিংবা ছবিতে দেখলে দোষের কী আছে, এতো সুন্দর ফুল, সুন্দর কাপড় কিংবা সুন্দর ভবন ও মনোরম উদ্যান ইত্যাদি দেখার মতই। ভালভাবে মনে রাখবেন, এটা নিছক ধোকা ও প্রবঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়। আসল কথা হল- সুন্দর মানুষ দেখার দর্শন-ক্ষুধা, আর সুন্দর দৃশ্য দেখার দর্শন-ক্ষুধা এক নয়। উভয় জিনিস দেখার দর্শন-ক্ষুধা কিছুতেই এক নয়। লক্ষ করুন, সুন্দর কাপড় দেখে কখনো তাকে জড়িয়ে ধরা কিংবা বুক চেপে ধরার বাসনা মনে জাগে না। কিন্তু সুন্দর মানুষ দেখলে এমনটা করতে ইচ্ছা করে। এতে বোঝা গেল যে, উভয় বস্তুর ‘দর্শন-ক্ষুধা’ এক নয় বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে আরেকটি ধোকার জায়গা হল- কিছু কিছু মানুষ বলে যে, আপন সন্তানকে দেখে যেমন বুক জড়িয়ে নিতে মনে চায় তেমনি অন্যের সন্তানকে দেখেও আমাদের বুক জড়িয়ে ধরতে মনে চায়। সুধীমণ্ডলী! আপন শেয়ানা পুত্র অন্যের শেয়ানা পুত্রের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আপন পুত্রকে জড়িয়ে ধরা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের, এতে কোন প্রকার শাহওয়াত ও যৌনক্ষুধার মিশ্রণ থাকে না। পক্ষান্তরে, অন্যের সন্তানকে বুক জড়িয়ে ধরার পর কারো কারো মনে আরও অগ্রসর হওয়ার, আরও কিছু করার খাহেশ ও কামনা জাগ্রত হয়। প্রিয়তমের বিরহ-বেদনা এক প্রকারের আর পুত্র বিচ্ছেদের বেদনা অন্য প্রকারের। এমনিতে তো সকল কুদৃষ্টিই ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক তবে ছেলেদের প্রতি কুদৃষ্টি ও বদনজরী হল সাক্ষাৎ প্রাণঘাতী বিষ।

এহেন জঘন্য অপকর্ম থেকে শরীয়ত কঠোরভাবে ভাষায় নিষেধ করেছে। আর আমাদের বড় ও বুয়ুর্গগণ এর ক্ষতি ও অপকারিতা এবং নীচতা ও জঘন্যতার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাতে বোঝা যায় যে, এটা চরম ঘণিত কাজ।

এক বুয়ুর্গ বলেন- কুদৃষ্টি ও বদনজরী শয়তানের এক বিষাক্ত তীর অর্থাৎ এই কুদৃষ্টির দ্বারা মানুষ শয়তানের শিকারে পরিণত হয়। হযরত আবুল কাসেম আল-কুশাইরী রহ. একজন বিখ্যাত বুয়ুর্গ। তিনি বলেন- যে ব্যক্তি দ্বীনদার হতে ইচ্ছুক তার জন্য সুশ্রী ছেলে ও সুন্দরী নারীদের সংশ্রব মারাত্মক ক্ষতিকর। এ গর্হিত কাজ তার জন্য ডাকাতের চেয়ে ভয়ঙ্কর। এ গর্হিত কাজ তাকে কিছুতেই তার চ, ডাস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌঁছতে দেবে না।

আরেক বুয়ুর্গ বলেন- আল্লাহ তাআলা যাকে আপন দরবার থেকে তাড়িয়ে দিতে চান তার মধ্যে সুশ্রী ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেন।

মোটকথা এটা বড় মারাত্মক ও ক্ষতিকর বিষয়। বদনজরী ও কুদৃষ্টির আরো ক্ষতিকর দিক আছে, যা অন্য গোনাহে নেই; তা এই, অন্যান্য গোনাহর অবস্থা হল- যদি তা মনভরে করে ফেলা হয় তাহলে তা থেকে মন উঠে যায়, আর করতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু কুদৃষ্টি এতই মারাত্মক ও ক্ষতিকর যে, যতই কুদৃষ্টি ও বদনজরী করা হয় ততই তার খাহেশ ও পিপাসা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। লক্ষ করুন, মানুষ খাবার খেলে তার পেট ভরে যায়, পানি পান করলে পিপাসা মিটে যায়, কিন্তু কুদৃষ্টির ব্যাধি এতই মারাত্মক ব্যাধি যে, এতে মন ভরেই না। তো ক্ষতি ও অনিশ্চিততার দিক থেকে এই গোনাহ সমস্ত পাপ ও গোনাহ থেকে ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক।

কিছু লোক তো একে আল্লাহ পাকের নৈকট্যের কারণ মনে করে! তাদের দাবী হল- তারা সুন্দর ও সুন্দরীদের এজন্য দেখে যে, তাদের মধ্যে তারা আল্লাহর কুদরত ও নিদর্শন দেখতে পায়! কিন্তু এটা নিছক শয়তানী ধোকা।

এক সুশ্রী ছেলের উপর এক আবেদের দৃষ্টিপাতের গল্প

শায়খ সাঈদ সাহেব তার গ্রন্থে একটি গল্প লিখেছেন, এক আবেদ যিনি লোকমুখে খুব পরহেয়গার বলে খ্যাত ছিলেন। একবার এক সুশ্রী ছেলের উপর তার নজর পড়ল। তাকে দেখতেই তার হাল ও ভাবের উদয় হল, সেখান থেকে ফিরতে গিয়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে বাকরাত (হিপোক্রেটিস) সে পথ ধরে কোথাও যাচ্ছিলেন, তিনি মানুষের জটলা দেখে প্রশ্ন করলেন কী হয়েছে? লোকজন উত্তর দিল- এক সুদর্শন বালককে দেখে এই বুয়ুর্গ তার মধ্যে আল্লাহ পাকের কুদরতের এমন বিরাট নিদর্শন দেখতে পেলেন যে, একেবারে বেহুঁশই হয়ে পড়লেন! লোকদের উত্তর শুনে বাকরাত (হিপোক্রেটিস) মন্তব্য করলেন- সদ্য ভূমিষ্ট শিশুর মধ্যেও তো আল্লাহ পাকের কুদরতের বিরাট নিদর্শন রয়েছে, তাকে দেখে কেন হাল ও বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয় না? যারা আল্লাহ পাকের কুদরতের নিদর্শন দেখতে পান তারা তা সুদর্শন বালক এবং উটের মধ্যে সমান দেখতে পান। যদি কেউ দাবী করে যে, সুন্দর ও সুন্দরীদের দর্শনে আমার হাল ও অবস্থা সৃষ্টি হয়। তাহলে বলতে হবে- ঐ ব্যক্তির দাবী ডাহা মিথ্যা। মানুষ তার স্বভাব ও প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করলে বিষয়টি নিজেই বুঝতে পারবে। তাই নিজেই পরীক্ষা করে দেখে নিন। আর এই খাহেশ ও যৌনক্ষুধাকে মানুষ নাম দিয়েছে ইশক ও মহব্বত। এটি আসলে ইশক ও মহব্বত নয়; বরং শাহওয়াত ও যৌনক্ষুধা, এই সমস্ত ফাসাদ ও মন্দের গোড়া হল- অর্থ-কড়ি। এমন লোকদের হাতে যদি অর্থ না থাকে এবং দু’তিন দিন ক্ষুধার্ত থাকে, তখন যদি তাদেরকে প্রশ্ন করা হয় যে, জনাব খাবার আনব, না সুন্দরী আনব? তখন তারা এই উত্তরই দেবে যে, সুন্দর সুন্দরী জাহান্নামে যাক, আমাকে আগে খাবার দাও।

ইশকে মাজাযি তথা ‘পার্থিব-প্রণয়’ এর নির্দেশের অর্থ

কিছু লোক বলে যে, মোল্লা জামী রহ. তো ইশক ও প্রণয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। হোক তা আল্লাহ পাকের ইশক কিংবা অন্য কারো ইশক। এ প্রসঙ্গে তিনি এক বুয়ুর্গের ঘটনা লিখেছেন- জটনৈক বুয়ুর্গের নিকট এক ব্যক্তি মুরীদ হতে গেলে বুয়ুর্গ তাকে বললেন যে, আগে আশেক ও প্রেমিক হও তাহলে তোমাকে মুরীদ করবা। এ গল্প থেকে কিছু নির্বোধ লোক বুঝে নিল যে, কোন বারঙ্গনা ও প্রমীলার প্রতি প্রেমাসক্ত হওয়া ছাড়া আল্লাহ পাকের ইশক ও মহব্বত পয়দা হয় না। এটা সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন ধারণা। এই ঘটনার অন্তর্নিহিত অর্থ ও মর্ম হল- যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের মিলন ও সান্নিধ্য কামনা করে তার জন্য দু'টি জিনিস থাকা অবশ্য কর্তব্য;

এক. আল্লাহ ভিন্ন অন্য সকল বন্ধুত্ব ও বন্ধন ছিন্ন করা। কারো সঙ্গে কোন প্রকারের সম্পর্ক ও সম্বন্ধ না থাকা।

দুই. আল্লাহ পাকের সঙ্গে গভীর ও নিবিড়তম সম্পর্ক ও সম্বন্ধ স্থাপন করা। এখন প্রশ্ন হল- অন্যান্য সম্পর্ক ও সম্বন্ধ কিভাবে ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন হবে? উত্তর, এর অনেক তরীকা ও পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল- যেসব বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক ও বন্ধন রয়েছে, তা থেকে অন্তরকে একে একে বিচ্ছিন্ন করা। আর পূর্বকালে এ রীতি ও প্রথাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত কঠিন। কারণ, যদি কারো মধ্যে দশটি বস্তুর প্রতি আসক্তি থাকে যেমন ঘর-বাড়ি, বাগ-বাগিচা ও সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির প্রতি কিংবা দশটা রোগ থাকে যেমন হিংসা-বিদ্বেষ, দস্ত-অহঙ্কার, শত্রুতা ও মোনাফেকী ইত্যাদি, আর এই পদ্ধতিতে এলাজ ও চিকিৎসা করতে হয় তাহলে প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক এলাজ করতে হবে। আর এতে দীর্ঘ সময় লাগবে। কিন্তু এরপরও কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটি থেকে যাবে। এ দীর্ঘসূত্রিতা লক্ষ করে পরবর্তী উত্তরসূরী বুয়ুর্গগণ দরদী চিকিৎসকের মতো একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। কারণ, দরদী চিকিৎসক যখন দেখেন রোগী তেতো অমুখের নাম শুনে চোখ মুখ কুচকে ফেলছে তখন তিনি হয় কৌশলে রোগীকে অমুখ পান করিয়ে দেন, নতুবা অমুখ পরিবর্তন করে দেন। তদ্রূপ পরবর্তী বুয়ুর্গগণ যখন দেখলেন যে, যদি কারো হাজারো বস্তুর প্রতি আসক্তি থাকে, আর একটি একটি করে প্রতিটি বস্তু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়, তাহলে তা একরূপই হবে যেমন কোন গৃহ খড়-কুটো ও আবর্জনায ভরে আছে তাহলে তা পরিষ্কার করতে হলে হয়ত একটি একটি করে খড়-কুটো উঠিয়ে বাইরে নিষ্ক্ষেপ করতে হবে এবং এভাবে সকল খড়-কুটো বাইরে নিষ্ক্ষেপ করে ঘর পরিষ্কার করতে হবে। কিন্তু এই পদ্ধতি অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর, আর এতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হবে, না হয় ঝাড়- দিয়ে সমস্ত খড়-কুটো জমা করে একত্রে বাইরে ফেলে দিতে হবে। তদ্রূপ এক্ষেত্রেও একটি ঝাড়- দরকার যা সমস্ত বন্ধন ও আসক্তিকে এক জায়গায় জড়ো করে অন্তর থেকে এক সঙ্গে বাইরে নিষ্ক্ষেপ করবে। এ নিয়ে বিস্তর চিন্তা-ভাবনা করে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ইশক ও মহব্বতই এমন এক বস্তু যা 'আপনা'কে ব্যতীত অন্য সব বস্তুকে বিনাশ করে নিজে পাকাপোক্ত আসন গেড়ে বসে। তার ত্রি-সীমানায় অন্য কোন বস্তুর নাম-নিশানা পর্যন্ত বরদাশত করে না।

লক্ষ করুন, যদি কেউ কারো প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে তাহলে মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, ধন-সম্পদ, গাড়ি-বাড়ি এমনকি জান পর্যন্ত তার জন্য বরবাদ করে দেয়। জৈনিক যমিদারের ‘ষাড়-আসক্তি’ ছিল চরম পর্যায়ের। এর পেছনে তিনি হাজার হাজার টাকা ফুঁকে দিয়েছিলেন। আমাদের প্রিয় উস্তাদ হযরত মাওলানা ফাৎহ মুহাম্মদ সাহেবের ‘গ্রন্থ-সংগ্রহ’ এর শখ ও আসক্তি ছিল প্রবল কিন্তু অধ্যয়নের প্রতি ততটা আসক্তি ছিল না। কিন্তু শত শত বই খরিদ করে রেখে গিয়েছিলেন। মোটকথা ইশক ও প্রেমাসক্তিই হল এমন এক বস্তু যা মা’শুক ও প্রিয়তম ব্যতীত অন্য সব কিছুকে মিটিয়ে দেয়। তাই পরবর্তী বুয়ুর্গগণ এই অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন যে, আগে ইশক ও মহব্বত সৃষ্টি করতে হবে, হোক তা যে কোন বস্তুর। এজন্য কেউ মুরীদ হতে এলে তারা প্রথমে তাকে এই প্রশ্ন করতেন যে, কোন কিছুর প্রতি নেশা ও প্রেমাসক্তি আছে কি না? তো বোঝা গেল প্রেম ও আসক্তির ক্ষেত্রে একথা কিছুতেই অপরিহার্য ও অনিবার্য নয় যে, তা মানুষের প্রতিই হতে হবে। এমনকি মহিষের আসক্তিও এক্ষেত্রে উপকারী। কারণ, উদ্দেশ্য তো হল সমস্ত সম্পর্ক, সম্বন্ধ ও আসক্তির ইতি ঘটিয়ে শুধুমাত্র একজনের ইশক ও মহব্বত সৃষ্টি করা। তারপর ঐ প্রিয় বস্তুর ইশক ও মহব্বত ছাড়িয়ে ইশক ও মহব্বতের গतिकে আল্লাহ অভিমুখী করা।

মহিষের ধ্যান করার নির্দেশ প্রদান

জৈনিক বুয়ুর্গের ঘটনা। এক ব্যক্তি তার নিকট মুরীদ হতে এল। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন- তোমার কি কোন কিছুর শখ ও আসক্তি আছে? লোকটি উত্তর দিল- মহিষের শখ ও আসক্তি আছে। বুয়ুর্গ চল্লিশ দিন পর্যন্ত লোকটিকে মহিষের ধ্যান করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে অন্য কেউ যেন এই আমল না করে। কারণ, প্রত্যেকের অবস্থাই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। কারো জন্য কোন বস্তু উপকারী আর কারো জন্য কখনো ঐ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে যে ঘটনা ঘটেছিল এক চিকিৎসক ও তার নির্বোধ শিষ্যের ক্ষেত্রে।

একদা জৈনিক চিকিৎসক তার নির্বোধ শাগরিদকে নিয়ে রোগী দেখতে গেলেন। রোগীর অবস্থা বিগত দিন থেকে কিছুটা খারাপ ছিল। চিকিৎসক রোগীকে দেখে মন্তব্য করলেন- তুমি নারঙ্গী ফল (কমলা লেবু জাতীয় টক ফল) খেয়েছ তাই তোমার রোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। রোগী সত্য স্বীকার করে বলল- মহোদয় ঠিকই বলেছেন, আমি নারঙ্গী খেয়েছি। রোগী দেখে ফেরার পথে শাগরিদ গুরুকে প্রশ্ন করল- গুরুজী আপনি কী করে বুঝতে পারলেন যে, রোগী নারঙ্গী খেয়েছে? গুরু উত্তর দিল- তার অবস্থা দেখে আমার ধারণা হল- সে কোন ঠাণ্ডা জাতীয় বস্তু আহার করেছে আর তার খাটের নিচে আমি নারঙ্গীর ছিলকা দেখতে পেয়েছি। তাতেই আমি বুঝতে পেরেছি যে, সে নারঙ্গী খেয়েছে।

শাগরিদ তো ছিলই নির্বোধ। যখন তার পড়া-লেখা শেষ হল তখন জৈনিক অসুস্থ নবাবকে দেখার জন্য তার ডাক পড়ল। নবাবের কক্ষে গিয়ে যখন সে দেখতে পেল যে, তার খাটের নিচে ওলের কাপড় রাখা আছে তখন সে মন্তব্য করে বসল যে,

আপনি ‘ওলের কাপড়’ খেয়েছেন! তাই আপনার এ রোগ হয়েছে। কারণ, আপনার খাটের নিচে ওলের কাপড় দেখতে পাচ্ছি!!

এ নির্বোধের এহেন মন্তব্য শুনে সকলেই হাসতে শুরু করল। কারোই বুঝতে বাকি রইল না যে, চিকিৎসক ‘আপাদমন্তক’ নির্বোধ। তো আল্লাহর ওয়াস্তে আমরা কেউ যেন দেখাদেখি কোন আমল করতে শুরু না করি। আর নামায-রোযা, যিকির-আযকার ছেড়ে দিয়ে মহিষের ধ্যানে লিপ্ত না হয়ে পড়ি। তো সারকথা হল- বুয়ুর্গ ব্যক্তি লোকটিকে নির্দেশ দিলেন যে, মহিষের ধ্যানে এক চিল্লা পূর্ণ কর। চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর আমাকে খবর দিও। ব্যস পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েই সে এক কোণে বসে মহিষের ধ্যানে মশগুল থাকত। যখন চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়ে গেল তখন বুয়ুর্গ আগমন করলেন এবং বাইর থেকে ডাক দিলেন, বেটা! বেরিয়ে আস। ভেতর থেকে লোকটি উত্তর দিল- হুযুর কিভাবে বেরিয়ে আসব? মহিষ যে শিং দিয়ে গুঁতো মারতে তেড়ে আসে। পীর সাহেব তাকে মনে মনে বাহবা ও মোবারকবাদ দিলেন। কারণ, উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। সব রোগ বিদায় নিয়েছে। এখন কেবল মহিষই রয়ে গেছে। আর কেবল একে বের করা নিতান্তই সহজ ব্যাপার। তো এই আলোচনা দ্বারা এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আল্লাহ পাকের ইশক ও মহব্বতের জন্য নারী কিংবা কোন সুশ্রী বালকের প্রতি প্রেম ও আসক্তি জরুরী নয়; বরং ক্ষেত্রবিশেষ তাদের প্রতি প্রেম ও আসক্তি বড় মারাত্মক ও আশঙ্কাজনক। কারণ, না জানি সুশ্রী বালক ও রূপসী নারীর প্রেমেই ফেঁসে যায় আর যা মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার প্রেম ও ভালোবাসা এবং মিলন ও সান্নিধ্য থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে যায়। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে কোন নারী ও সুশ্রী বালকের ভালোবাসায় জড়ানো উচিত নয়। হ্যাঁ, যদি অনিচ্ছায় কোন সুশ্রী বালক ও সুন্দরী নারীর প্রেমে পড়ে যায় তাহলে তা দ্বারা আল্লাহ পাকের মহব্বত ও ভালোবাসা লাভ করা যেতে পারে। তবে শর্ত হল- প্রিয়জনের নিকট যেতে পারবে না, তার সঙ্গে অবস্থান করতে পারবে না, তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। এমনকি তার কণ্ঠস্বর পর্যন্ত শ্রবণ করতে পারবে না এবং যতদূর সম্ভব মনে মনে তাকে কল্পনাও করা যাবে না। মোটকথা যথাসম্ভব তার থেকে সার্বিকভাবে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে, যদিও তাতে নফসের খুব কষ্ট হবে। কিন্তু এতে হিম্মত হারানো যাবে না, মনকে শক্ত করে কিছুদিন এ কাজ করলে হৃদয়ে একপ্রকার ‘জ্বলা ও জ্বলন’ সৃষ্টি হবে যার দ্বারা অন্তর থেকে ইজ্জত-সম্মান, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মোহ ও আকর্ষণ এবং আসক্তি ও ভালোবাসা বিদায় নিবে। তারপর তার হৃদয় যখন প্রেম ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তখন পীর সাহেব এই প্রেম ও ভালোবাসাকেই প্রেমাস্পদ থেকে ছিন্ন করে আল্লাহ পাকের সঙ্গে যুক্ত করে দেন। যদি উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী আমল করা যায় তাহলে এই ইশক ও মহব্বত দ্বারাও আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌঁছা যায়। আর যদি প্রিয়জন থেকে দূরে না থাকা হয়, সরে না থাকা হয়; বরং তার সঙ্গেই অবস্থান করা হয়, পরস্পরে প্রেমালাপ করা হয়, পত্রমিতালী করা হয় তাহলে সর্বদা এই জঞ্জালেই ফেঁসে থাকার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে

ফলে কখনোই সে এই জঞ্জাল থেকে মুক্ত হতে পারবে না। তাই তো স্বয়ং মাওলানা জামী রহ. বলেন- দেখ, প্রিয়জনের রূপেই মজে যেও না। এটা পথের সেতু মাত্র, তাই দ্রুত তা পার হয়ে যাওয়া উচিত।

তো বুয়ুর্গ ও আল্লাহর অলিগণ যে ইশক ও প্রেমের কথা বলেছেন তার অর্থ ও মর্ম এই নয় যে, মন ভরে নজরবাযি কর, দর্শন-লালসা চরিতার্থ কর, আর মনে মনে এই ধারণা পোষণ কর যে, আমি তো বড় সাধু পুরুষ তাই আমার জন্য সবই বৈধ। আর এতেই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ হবে। তো শুনে রাখুন এতে আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও সান্নিধ্য তো দূরের কথা বরং বহু দূর ছিটকে পড়তে হবে। এমনকি আল্লাহ তাআলা এতে ভীষণ অসন্তুষ্ট হন।

গায়রুল্লাহর প্রতি দৃষ্টিপাত করা বড় মারাত্মক গোনাহ

হাদীস শরীফে আছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- আমার মধ্যে প্রচণ্ড গায়রত ও আত্মসম্মানবোধ রয়েছে আর আল্লাহ তাআলা আমার চেয়ে অনেক বেশি গায়রত ও আত্মসম্মানের অধিকারী। আর এই গায়রত ও আত্মসম্মানের কারণেই আল্লাহ তাআলা সমস্ত অন্যায ও গর্হিত কর্মকাণ্ডকে চিরতরে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তো চোখে অবৈধ জিনিস দেখা, কানে অবৈধ জিনিস শোনা, হাতে অবৈধ জিনিস স্পর্শ করা আর পায়ের সাহায্যে অবৈধ জিনিসের কাছে যাওয়া সবই চরম অন্যায ও গর্হিত কাজ। কারণ, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সবকেই যিনা অর্থাৎ বদকারী ও অপকর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই এ প্রসঙ্গে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- চোখ যিনা করে, চোখের যিনা হল- দেখা। কান যিনা করে, কানের যিনা হল- শোনা। যবান যিনা করে, যবানের যিনা হল- আলাপ (অর্থাৎ যৌন লালসা নিয়ে কোন সুশ্রী বালক বা নারীর সঙ্গে আলাপ করা) হাত যিনা করে, হাতের যিনা হল- ধরা-স্পর্শ করা (অর্থাৎ পরনারী কিংবা সুশ্রী বালকদের ধরা ও স্পর্শ করা)।

লক্ষ করুন, যদি এগুলো চরম অন্যায ও গর্হিত কাজ না হত তাহলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন এগুলোকে যিনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতে বোঝা গেল, এগুলো চরম ঘৃণিত কাজ। আর সকল ঘৃণিত অপকর্মই আল্লাহ পাকের শানে গায়রত ও আত্মসম্মানের পরিপন্থী। তো বোঝা গেল এহেন কাজ আল্লাহ পাকের নিকট এতটাই ঘৃণিত ও গর্হিত যে, তাতে আল্লাহ তাআলা ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। আর বড় পরিতাপের বিষয় হল- কতক অসতর্ক পীর সাহেবও এতে ফেঁসে আছে। নারীরা তার সঙ্গে পর্দা করে না। উপরন্তু এর পক্ষে তারা যুক্তি দেখায় যে, পীর সাহেব তো পিতার মতো; বরং পিতার চেয়েও বেশি কিছু, তাহলে তার সঙ্গে আবার কিসের পর্দা। বড় নির্লজ্জভাবে নির্ধিধায় বিনা বাধায় তারা পীরের সামনে আসা-যাওয়া করে। যে পুরুষ অভিভাবক তার স্ত্রী-কন্যাদের এ ধরনের পীর ফকীরদের কাছে যেতে দেয় সে সম্পূর্ণ বেহায়া নির্লজ্জ 'দায়য়ুছ'।^১ আল্লাহ মাফ করুন। কতক বেশরা পীরের ব্যাপারে এমনও

শোনা যায় যে, নারীরা একাকী পীরের বিশেষ কামরায় প্রবেশ করে যেখানে পীর তার অন্যান্য পুরুষ মুরীদদের নিয়ে অবস্থান করে।

তো বলুন দেখি, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে বড় বুয়ুর্গ আর কে হতে পারে। আর উম্মতের সকল নারীই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রূহানী কন্যা। তিনি নিজেও ছিলেন নিষ্পাপ, তাঁর ব্যাপারে কোন প্রকার পাপের কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু তবুও নারীদের প্রতি তার সঙ্গে পর্দা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল।

অপর পক্ষে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহীয়সী স্ত্রীগণ উম্মতের সমস্ত পুরুষের জননী ছিলেন। এই বিষয়টি আল্লাহ তাআলা কোরাআন শরীফে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন। আর কোন ঈমানদার তো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহীয়সী স্ত্রীদের ব্যাপারে বিন্দু পরিমাণ পাপের সন্দেহ করতে পারে না। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ‘গৃহকোণে’ অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করেছেন। বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন। এবং পরপুরুষের সঙ্গে নরম ও কোমল ভাষায় কথা বলতে নিষেধ করেছেন। কারণ, যাদের অন্তরে রোগ আছে তাদের (যৌন) লালসা জেগে উঠতে পারে। এজন্যই বুয়ুর্গ ও আল্লাহর অলিগণ বলেছেন- পুরুষদের জন্য নরম ও কোমল ব্যবহার করা ভাল আর নারীদের জন্য রুঢ় আচরণ মঙ্গলজনক। অর্থাৎ পরপুরুষের সঙ্গে নারীদের নরম ও মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা উচিত নয় আবার মাত্রাতিরিক্ত রুঢ় ও রুক্ষ হওয়াও উচিত নয়; অর্থাৎ অতি কোমল হওয়াও উচিত নয়, আবার অতি রুঢ় হওয়াও উচিত নয়। ব্যস এমনভাবে কথা বলবে, যেন যাকে লক্ষ করে বলা হচ্ছে সে শুনতে পায়, আর তার মনে যেন কোন প্রকারের কামনা সৃষ্টি হওয়ার পরিস্থিতি না হয়। অত্যন্ত নিরস কণ্ঠে কথা বলবে। হ্যাঁ, স্বামীর সঙ্গে এবং অন্যান্য নারীদের সঙ্গে কোমল ও মধুর আচরণ করবে।

সুধীমণ্ডলী! লক্ষ করুন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীদেরকে এই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। তাহলে বর্তমানে এমন কে আছে যে নিজেকে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলে দাবী করতে পারে? বরং বর্তমান যুগ তো ফেতনা ফাসাদের যুগ, তাই এ যুগে পর্দা-পুশিদার প্রতি অনেক বেশি যত্নবান হওয়া উচিত। কখনও ভুলেও পরপুরুষের সামনে নিজেকে প্রকাশ করা উচিত নয়।

পর্দার ব্যাপারে শিথিল ও অসতর্ক এক বুয়ুর্গের ঘটনা

জৈনৈক বুয়ুর্গ ছিলেন, যিনি পর্দা-পুশিদার ব্যাপারে ততটা সতর্ক ও সাবধান ছিলেন না; বরং নারীদের ঢালাউভাবে নিজের সম্মুখে আসতে দিতেন, কাউকে বারণ করতেন না। তিনি মনে করতেন, আমি তো খুব বৃদ্ধ হয়ে গেছি তাই এখন আমার সম্মুখে আসাতে অসুবিধা কোথায়? আরেক বুয়ুর্গ তাকে নছীহত স্বরূপ বললেন- জনাব! পরনারীদের আপনার সামনে আসতে নিষেধ করুন। কিন্তু উক্ত বুয়ুর্গ শেষোক্ত বুয়ুর্গের সুহদ

পরামর্শ ততটা আমলে নিলেন না। পূর্বের মতোই নারীদের সামনে আসতে কোন প্রকার নিষেধ করতেন না। অবশেষে একবার তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন। স্বপ্নে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন- হুয়ুর! আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি, এখন আমার সামনে নারীদের আসাতে তো কোন আশঙ্কা ও অসুবিধা নেই, তাই এখনও কি আমার সঙ্গে তাদের পর্দা করা জরুরী হবে, না আমার সামনে তাদেরকে আসতে দেওয়া বৈধ হবে? উত্তরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- যদি কোন পুরুষ বুয়ুগীতে জুনাইদ বাগদাদীর স্তরে উপনীত হয়, আর কোন নারী রাবেয়া বসরীর ধাপে উন্নীত হয়, তারপর তারা দু'জন কোন নির্জন স্থানে পরস্পরে সাক্ষাতে মিলিত হয় তাহলে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে সেখানে শয়তান হাযির হবে (আর তাদের দ্বারা কোন না কোন অপকর্ম ঘটিয়েই ছাড়বে) অর্থাৎ তারপরও নারীদেরকে সামনে আসতে দেওয়া কী করে জায়েয হতে পারে?

আর মানুষ যতই বৃদ্ধ হোক, তার মধ্যে যৌন-চাহিদা কিছু না কিছু বিদ্যমান রয়েই যায়। বৃদ্ধ হলে তো সে আর ফেরেশতা হয়ে যায় না। হ্যাঁ, বৃদ্ধ হলে কিছু করতে পারে না সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে কুদৃষ্টি ও নজরবাযির জন্য তো শক্তিরও ততটা প্রয়োজন হয় না। বৃদ্ধ হলেও তো বেচারী কুদৃষ্টি ও নজরবাযির অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। আর সৃষ্টিগতভাবেই তো পুরুষের মধ্যে নারীর প্রতি আকর্ষণ গচ্ছিত রাখা হয়েছে। আর এই সৃষ্টিগত আকর্ষণ ও আসক্তি মানুষ কিভাবে উপেক্ষা করবে?

মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ. এর ঘটনা

গঞ্জেমুরাদাবাদে একজন মহান বুয়ুর্গ ছিলেন। তাঁর ছিল ফজলুর রহমান। এক শীতের মৌসুমে আনুমানিক একশ দশ বছর বয়সে আমি তাঁর খেদমতে হাজির হয়েছিলাম। সকালে উঠে তিনি খাদেম ডেকে বলতে লাগলেন- আমার গোসল ফরজ হল কি না সন্দেহ হচ্ছে! তাই গোসল করে নিলে ভাল হত! মনের খুঁত খুঁত দূর হয়ে যেত। সুতরাং পানির ব্যবস্থা কর। খাদেম পানির ব্যবস্থা করল। আর তিনি সেই কনকনে শীতে গোসল করলেন! সুধীমণ্ডলী! এখন আপনারাই বলুন, বৃদ্ধকালে যদি যৌন চাহিদাই না থাকত তাহলে গোসল ফরজ হওয়ার সন্দেহ হয় কিভাবে?

কানপুর থাকতে একবার আমার বাড়িতে সম্ভ্রান্ত পবিরাবের কিছু মহিলা আগমন করল। তারা পরস্পরে এ নিয়ে আলোচনা করছিল যে, বর্তমানে মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ. এর সঙ্গে পর্দা করতে হবে কি না? কারণ এখন তো তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তো কেউ মত দিল পর্দা করা উচিত আর কারো মত ছিল এ বয়সে তার সঙ্গে আর পর্দা করা জরুরী নয়। কারণ, তার মধ্যে আর আছেটাই কি যে, তার সঙ্গে পর্দা করতে হবে। তাদের কথা-বার্তা যখন আমার কানে পড়ল তখন আমি হযরত মাওলানার উল্লিখিত ঘটনা উপস্থিত সকলকে শুনিয়ে দিলাম যে, এই কিছুদিন আগের ঘটনা, একবার ভোরে ঘুম থেকে উঠে তার মনে সন্দেহ দেখা দিল যে, তার

উপর গোসল ফরজ হয়ে গেল কি না? আর সন্দেহের ফলে তিনি গোসলও করেছিলেন। এখন তোমরাই ফায়সালা কর- এই বয়সেও তার সঙ্গে পর্দা করা জরুরী কি না? এই ঘটনা শুনে সকলেই নীরব হয়ে গেল।

সুধীমণ্ডলী, শতায়ু বৃদ্ধের বেলায় যখন এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে বর্তমানে পঞ্চাশ বছর বয়সে এ ধরনের ঘটনা ঘটা অসম্ভব হয় কী করে? একে তো বর্তমানে অনেক পীর একেবারে জোয়ান ও উঠতি বয়সী, তাহলে এ ধরনের পীরদের সঙ্গে পর্দা না করা কিভাবে জায়েয হতে পারে। উপরন্তু আজকাল যে কেউ পীর হতে পারে। পীর হওয়া এমন কঠিনই বা কি? লম্বা চুল, বড় বড় দানার তাসবীহ, লাল শালু গায়ে ধারণ করলেই হল, ব্যস তিনি পীর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যাবেন। এরপর চাই সে মন ভরে রূপসী নারীদের দেখুক কিংবা সুশ্রী বালকদের সঙ্গে রাখুক এবং চাই সে বৈধ কাজ করুক কিংবা অবৈধ কাজ। তার পীরগিরি এতটাই দুর্ভেদ্য হয় যে, তাতে কিছুতেই ফাটল ধরে না কিংবা কিছুতে ভাঙ্গে না। আর জনসাধারণের অবস্থা হল- যে ব্যক্তি যত বেশি শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত তারা তত বেশি তার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ করে! কারণ, সে আল্লাহর নিকট সবচে বেশি মকবুল ও মর্যাদাবান! আর যে ব্যক্তি যত বেশি শরীয়ত মুতাবেক চলে তাকে মনে করে যে, এ কি করে পীর হতে পারে, এতো নিরেট মোল্লা। এতো গেল পুরুষদের অবস্থা। এখন নারীদের অবস্থাও শুনুন।

নারীদের মধ্যেও নজরবাযি ও কুদ্‌ষ্টির রোগ রয়েছে

কিছু নারী তো এতটাই নির্লজ্জ ও বেহায়া যে, তারা নিজেরাও পরপুরুষকে দেখে এবং নিজেদেরকেও পরপুরুষের সামনে প্রদর্শন করে। (বাইরে বেরুলে বোরকা ছাড়া বের হয়) আর ঘরে থাকলে পর্দা সরিয়ে দেয় ফলে পরপুরুষ তাদেরকে দেখে ফেলে। আর এক্ষেত্রে সামান্যতম সতর্কতাও অবলম্বন করে না। অথচ হাদীস শরীফে এসেছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- لعن الله الناظر والمنظور إليه- অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা দর্শক ও দর্শিত উভয়কে অভিশাপ দিয়েছেন। শুয়াবুল ঈমান, বায়হাকী

নারীদেরকে যদি পর্দার ব্যাপারে নছীহত করা হয় তাহলে তারা উত্তর দেয় যে, তারা দেখলে তো একবারই দেখবে, তাতে আর কী হবে। হে ভদ্র মহোদয়গণ! মন দিয়ে শুনুন। কী আর হবে, একথা বলছেন অথচ একটু চিন্তা করে দেখুন তো, যে একবার দেখবে, আর তাতেই যদি তার মনে লেগে যায় তাহলে সারা জীবন আক্ষেপ করবে। আর যাদেরকে খুব পর্দানশীন বলে ধারণা করা হয় তাদের অবস্থা হল- ঘরে স্বামীর সামনে মেথরনীর মতো হয়ে থাকে আর কোথাও বেড়াতে গেলে খুব সাজগোজ করে বেগম সেজে যায়। এটা বড়ই নির্লজ্জতা যে, যার সামনে সেজেগোজে থাকার কথা তার সামনে সাজ-গোজ না করে অন্যদেরকে প্রদর্শনের জন্য খুব সাজিয়ে গুছিয়ে নিজেকে উপস্থাপন করো।

কিছু কিছু নারী বর কনে ও বরযাত্রী দেখে আর তাদেরকে তাদের স্বামী কিংবা অভিভাবকরাও কিছু বলে না। এ সব বড়ই নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা। কিছু পুরুষ মানুষ বড় অসতর্ক একটি কাজ করে, তা হল তারা ঘরে আওয়াজ দিয়ে প্রবেশ করে না। সামান্য কাশি দিয়ে বা গলা ঝারা দিয়ে তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকে পড়ে। একবার আমি অসুস্থ ছিলাম। (তখনকার বাহন) পালকীতে চড়ে অনেক শুভাকালক্ষী নারী আমার খোঁজ-খবর নিতে এল। বাইর থেকে ‘আগমনী বার্তা’ না দিয়েই ঘরে ঢুকে পড়ল। এতে আমি কঠোরভাবে তাদেরকে শাসলাম। আর এমনিতেও নারীরা যখন কোথাও একত্র হয় তখন তারা একেবারে বেহায়া ও নির্লজ্জ হয়ে যায়। বারংবারই এমনটা ঘটতে দেখা যায় যে, ঘরের পুরুষ ব্যক্তি এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যায়, তখন তাদের কেউ কেউ চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়, কেউ আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে নেয়, কেউ কারো পেছনে লুকোয়! আর আরও আশ্চর্যের বিষয় হল- তাদের প্রত্যেকেই একথা মনে করে যে, আমাকে দেখিনি! অথচ সে সকলকেই দেখে ফেলেছে। মোটকথা চোখের গোনাহ বড় মারাত্মক গোনাহ। আর এতে বহু লোক ফেঁসে আছে। এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা উচিত, নিজেও সতর্ক থাকা ও পরিবারস্থ সকলকে সতর্ক রাখা। আর এ ব্যাপারে ঘরে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা। যাতে সুযোগসন্ধানীরা এ ধরনের অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে।

নজরবাযি ও কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার সহজ পথ

আর এই গোনাহ থেকে বাঁচার সহজ পথ হল- চলতে ফিরতে দৃষ্টি অবনত রেখে চলা, এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত না করা। ইনশাআল্লাহ এতে করে বহু গোনাহ থেকে বাঁচা যাবে। শয়তানকে যখন আল্লাহ পাকের দরবার থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন সে একথাই বলেছিল যে, আমি মানুষকে বিপথগামী করার জন্য সরল ও সহজ পথে বসে থাকব, যার উপর আপনি তাদেরকে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর আমি তাদেরকে সামনে থেকে বিপথগামী করব, পেছন থেকে বিপথগামী করব, ডান দিক থেকে বিপথগামী করব এবং বাম দিক থেকে বিপথগামী করব। তো সে চারদিকে থেকে বিপথগামী করার কথা বলেছে, তাই দুটি দিক বাকি রয়ে গেছে। উপর দিক, আর নিচের দিক।

বড় বড় বুয়ুর্গণ এই বক্তব্যের বড় চমৎকার তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন যে, শয়তান উপর ও নিচের দিকের কথা ইচ্ছা করেই উল্লেখ করেনি। শুধু চারদিক থেকেই বিপথগামী করার কথা বলেছে। কারণ, বেশির ভাগ গোনাহ মূলত এই চারদিক থেকেই হয়ে থাকে। তো গোনাহ থেকে মুক্ত থাকার কেবল দু’টি দিক বাকি রইল, হয় উপর দিক তাকিয়ে চলা কিংবা নিচের দিকে দৃষ্টি রেখে চলা। উপর দিকে তাকিয়ে চলার ক্ষেত্রে হোঁচট খাওয়ার কিংবা গর্তে পড়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে, অথবা চোখে কোন কিছু পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই এখন একটিই মাত্র পথ খোলা রইল, তা হল দৃষ্টি অবনত করে নিচ দিকে তাকিয়ে চলা।

জনৈক বুয়ুর্গের পুরুষদের প্রতি না তাকানোর ঘটনা

এক বুয়ুর্গ ছিলেন যিনি কথা বলার সময় পুরুষদের চেহারার দিকে তাকাতেন না। কেউ তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন- মানুষ মূলত দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণী হল- যাদেরকে আমি চিনি, জানি। দ্বিতীয় শ্রেণী হল- যাদেরকে আমি চিনি না, জানি না। তো যাদেরকে আমি চিনি তাদেরকে না দেখে কণ্ঠস্বর শুনেই চিনতে পারি। তো এক্ষেত্রে তার দিকে তাকানোর কি দরকার। আর যাদেরকে আমি চিনি না তাদেরকে দেখে কী লাভ? সুবহানালাহ! একেই বলে হাদীসের উপর আমল করা। কারণ হাদীস শরীফে এসেছে-

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

অনর্থক কাম কাজ পরিহার করা মানুষের পূর্ণাঙ্গ দীনদার হওয়ার পরিচয়। তিরমিযী : ২৩১৭

তো দেখুন এই মহামানব অহেতুক দৃষ্টিপাত পর্যন্ত পরিহার করেছেন!

কুদৃষ্টির গোনাহ এড়ানোর জন্য কতক বুয়ুর্গ তো জনমানবহীন স্থানে বসবাসকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন

কতক বুয়ুর্গ তো কুদৃষ্টির গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য জঙ্গলে বসবাস করাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এক চক্ষুবিহীন জনৈক বুয়ুর্গ আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করছিলেন আর এ দুআ করছিলেন হে আল্লাহ! আমি আপনার ক্রোধ ও গোস্বা থেকে পানাহ চাই। তার এই খোদাভীতির অবস্থা দেখে কেউ প্রশ্ন করল কী ব্যাপার, এত ভয় করছেন কেন? প্রতি উত্তরে তিনি বলেন- আমি এক সুশ্রী বালকের দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম। তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য এক চপেটাঘাতে আমার এক চোখের দৃষ্টি চিরতরে হারিয়ে যায়। তাই ভয় করছি, না জানি পুনরায় এমনটা ঘটে যায়।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহ. পথ ধরে চলছিলেন, ইতিমধ্যে বিপরীত দিক থেকে একটি সুদর্শন খ্রিস্টান ছেলে আসছিল। তখন জনৈক মুরীদ তাকে প্রশ্ন করল যে, হযরত এমন সুদর্শন চেহারার অধিকারীকেও আল্লাহ পাক দোযখে নিক্ষেপ করবেন? হযরত জুনাইদ রহ. উত্তরে বললেন- সম্ভবত তোমার নজরে তাকে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছে, আর আকর্ষণীয় লাগার কারণে তুমি তাকে মন ভরে দেখেছও। তো দু'একদিনের মধ্যেই তুমি দেখতে পাবে এর কেমন সাজা ও মজা ভোগ কর। আল্লাহ মাফ করুন, অবশেষে সে এই সাজা পেল যে, সমস্ত কোরআন শরীফ ভুলে গেল। কিছুমাত্র মুখস্থ রইল না।

কিছু বুয়ুর্গ ও মহামানবের সৌন্দর্যপ্রেমী হওয়ার অর্থ ও মর্ম

কিছু বুয়ুর্গ এমনও ছিলেন যারা সৌন্দর্যপ্রেমী ছিলেন। তাদের এই সৌন্দর্যপ্রেম দেখে কিছু মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হয়, তারা মনে করে সুশ্রী চেহারাধারীদের দেখা, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা জায়েয। তাই তারা বলে বেড়ায় যে, মির্যা মায়হার জানেজাঁও বড় বুয়ুর্গ ছিলেন, সৌন্দর্যপ্রেমী ছিলেন। সুশ্রী ও সুদর্শন চেহারার প্রতি তার প্রবল টান

ও আকর্ষণ ছিল। তাদের জন্য তিনি প্রাণউৎসর্গী ছিলেন। তাহলে আমরা এরূপ করলে দোষ কি? বাহ! বাহ! জনাব আপনার বিচার-বুদ্ধি এতটাই স্বচ্ছ যে, আপনি বুয়ুর্গ ও মহামানবদের আপনার মতো ভাবছেন। সুশ্রী চেহারার প্রতি তার আকর্ষণ কি আমার আর আপনার মতোই ছিল। কিছুতেই না। কারণ, সকল সুন্দর ও সুদর্শন বস্তু তার কাছে স্বভাবগতভাবেই ভাল লাগত। হোক তা মানুষ কিংবা অন্য কোন বস্তু। আর যে জিনিসই বিশ্রী ও অসুন্দর হত তা নজরে পড়লে তাঁর কষ্ট হত। তাই তো মির্যা জানে জাঁ রহ. কোথাও যেতে হলে পালকিতে চড়ে যেতেন এবং পালকির কপাট বন্ধ করে দিতেন। তিনি বলতেন পথে-ঘাটে বাজার ও দোকানপাট ইত্যাদি পড়ে, কিছু দোকান এমনও থাকে যেগুলো যেনতেনভাবে বানানো, এসব চোখে পড়লে আমার প্রচণ্ড কষ্ট হয়। থানাভবনে একজন বিচারপতি ছিলেন, তিনি এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে মির্যা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। বিচারপতির সফরসঙ্গীর নাক পরিষ্কার করার প্রয়োজন হলে সে উঠে যখন নাক পরিষ্কার করতে গেল তখন মির্যা সাহেবের দৃষ্টি তার পায়জামার উপর পড়ল, তখন তিনি দেখতে পেলেন তার পায়জামার সবগুলো ভাঁজ ও ভাঙ্গন পেছন দিকে। এ দৃশ্য দেখতেই হযরত মির্যা সাহেবের মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেল। তখন তিনি বিচারপতিকে লক্ষ করে বললেন- জনাব! একে সঙ্গে নিয়ে আপনি চলাফেরা করেন কিভাবে?

হযরত মির্যা সাহেবের আরও কিছু ঘটনা শুনুন

এক. দ্বিতীয় আকবর শাহ যিনি তার যুগে বাদশাহ ছিলেন। একবার তিনি হযরত মির্যা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। বাদশাহর পিপাসা লাগল কিন্তু হযরতের কোন খাদেম উপস্থিত ছিল না, তাই বাদশাহ নিজে উঠে গিয়ে পানি পান করলেন। পানি পান করে তিনি সোরাহী কাত করে রেখেছিলেন। আর এতেই মির্যা সাহেবের মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেল। তিনি অস্থির ও পেরেশান হয়ে পড়লেন। কিন্তু ধৈর্য ধরলেন। বিদায়কালে বাদশাহ আরজ করলেন- হযরত আপনার সেবা-যত্নের জন্য কি কোন খাদেম নেই? যদি অনুমতি দেন তাহলে কাউকে সেবা করার জন্য পাঠিয়ে দেব। বাদশাহর কথায় হযরতের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি বলে ফেললেন- আগে নিজে মানুষ হও। পানির সোরাহীটা পর্যন্ত ঠিক করে রাখতে জান না, অথচ তুমি দেশ চালাও।

দুই. জনৈক ব্যক্তি হযরত মির্যা সাহেবের খেদমতে দামী ও উন্নতমানের কিছু আঙ্গুর হাদিয়া নিয়ে এল। হাদিয়া পেশ করে সে এই অপেক্ষায় ছিল যে, হযরত আঙ্গুরের খুব প্রশংসা করবেন। কিন্তু হযরত একেবারে নীরব ও চুপচাপ রইলেন। অবশেষে সে আর থাকতে না পেরে প্রশ্ন করল হযরত আঙ্গুর কেমন লাগল? হযরত উত্তর দিলেন- আঙ্গুর থেকে মূর্দারের গন্ধ আসছে! অনুসন্ধান করে জানা গেল, আঙ্গুর গাছ কবরস্থানে রোপণ করা হয়েছিল! আর এগুলো হল সেই গাছের আঙ্গুর।

তিন. ‘সুন্দর গঠন ও সুদর্শন চেহারা ভাল লাগা’ এটি হযরত মির্যা সাহেবের জন্মগত বিষয় ছিল। তাঁর স্বভাবই এমন প্রকৃতির ছিল যে, সকল সুন্দর বস্তুই তাঁর কাছে ভাল

লাগত। তাঁর মাধ্যে খারাপ চিন্তার লেশমাত্রও ছিল না। কারণ, শৈশবকালেও তিনি বিশ্রী ও কদাকার চেহারার লোকদের কোলে যেতেন না। তো কুমতলব ও খারাপ চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যদি তিনি সুশ্রী ও সুন্দর চেহারার প্রতি আকৃষ্ট হতেন তাহলে শৈশবে তো আর এমনটা ঘটীর কথা ছিল না। কিন্তু তবুও হযরত মির্যা সাহেব নিজের এই অবস্থাকে পছন্দ করতেন না। তাইতো যখন লোকজন এসে তাঁর কাছে খাজা মীর দরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, তিনি গীত ও বাদ্য শুনেন। তখন উত্তরে তিনি বললেন- তিনি ‘শ্রবণ-ব্যধিতে’ আক্রান্ত। আর আমি ‘দর্শন-ব্যধিগ্রস্ত’। দেখুন তিনি নিজেই একে ব্যধি ও মরয আখ্যায়িত করেছেন। আর রোগ ব্যধি তো খরাপ ও অপিয় জিনিসকে বলা হয়। তাহলে সাধারণ লোকদের কিভাবে সুন্দর ও সুশ্রী চেহারাধারীদের সঙ্গে মেলামেশা করা বৈধ হতে পারে।

জৈনিক বুয়ুর্গের ঘটনা

একটি সুদর্শন ছেলে জৈনিক বুয়ুর্গের খেদমত করত। আর তিনি তাকে মাঝেমধ্যে আদর-স্নেহ করতেন। একদিন বুয়ুর্গ তাঁর এক মুরীদকে দেখলেন এক বালককে আদর করছে। বুয়ুর্গ বুঝতে পারলেন যে, সে আমার দেখাদেখি এই কাজ করছে। এরপর তিনি একদিন বাজারে গেলেন। কামারের দোকানের সামনে গিয়ে দেখলেন- তপ্ত লোহা জ্বলন্ত লাল অঙ্গারের মত হয়ে আছে। পীর সাহেব সেই লোহাকে ধরে আদর করতে লাগলেন আর মুরীদকে লক্ষ করে বললেন- জনাব! আসুন, পারলে আপনিও একে পেয়ার ও আদর করুন। কিন্তু মুরীদ ভয়ে অগ্রসর হতে সাহস পেল না। তখন তিনি মুরীদকে কঠোরভাবে শাসিয়ে বললেন- খবরদার কখনো আমার দেখাদেখি কোন কাজ করবে না। আর কখনো আমার সমান ও বরাবর হওয়ার ধারণা করবে না।

আরেক বুয়ুর্গের ঘটনা

জৈনিক ব্যক্তি সুদর্শন বালক কর্তৃক এক বুয়ুর্গের পা দাবাতে দেখল, এ দৃশ্য দেখে তার মনে প্রশ্ন জাগল যে, এ আবার কেমন বুয়ুর্গ, যে বালকদের দ্বারা পা দাবায়। বুয়ুর্গ তার মনের অবস্থা আঁচ করতে পেরে বললেন- জ্বলন্ত অঙ্গার ভর্তি আগুন পোহানোর পাত্র নিয়ে আস। পাত্র হাযির করতেই তিনি পাত্রের ভেতর পা রেখে দিলেন আর বললেন- এ ক্ষেত্রে আমার ভিন্ন কোন অনুভূতি নেই তাই আগুন ও বালক আমার কাছে বরাবর।

যার যাহের ও বাতেন শরীয়ত মুতাবেক তিনিই পীর হিসেবে গ্রহণ ও বরণ যোগ্য তবে মনে রাখবেন, এ ধরনের বুয়ুর্গ যাদের যাহের পুরোপুরি শরীয়ত মুতাবেক নয় তাদের হাতে মুরীদ হওয়া জায়েয নয়। যার যাহের ও বাহ্যিক অবস্থা পরিপূর্ণ শরীয়ত মুতাবেক তিনিই পীর হিসেবে বরণযোগ্য। আর যে বুয়ুর্গদের বাহ্যিক অবস্থা শরীয়ত পরিপন্থী তারা শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ ও অনুসারী নয়। কারণ, শরীয়তেরই অন্যতম একটি বিধান হল- সন্দেহ ও ভুল বোঝা-বুঝির সৃষ্টি হতে পারে এমন কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকা। আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও এই অভ্যাস ছিল।

একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে এতেকাফ করছিলেন। হুজুরের স্ত্রী ছাফিয়া রাযি। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মসজিদে এলেন। ফেরার পথে তাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য দরজা পর্যন্ত এলেন। দরজা পর্যন্ত পৌঁছতেই দেখতে পেলেন বিপরীত দিক থেকে দু' জন ব্যক্তি আসছে। তিনি তাদেরকে লক্ষ করে বললেন- তোমরা একটু অপেক্ষা কর, এই বলে তিনি হযরত ছাফিয়াকে বিদায় করে তাদের দিকে লক্ষ করে বললেন- এই নারী কোন পরনারী ছিল না, বরং ছিল আমার স্ত্রী ছাফিয়া। আগন্তুক সাহাবাদ্বয়ের নিকট প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই আচরণ খুব কষ্টকর মনে হল। তাই তারা আরজ করল যে, হুজুর আপনার ব্যাপারে কি আমাদের মনে কোন ধরনের কুধারণা জাগতে পারে? উত্তরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- শয়তান মানবদেহের শিরায় শিরায় ছোট্ট ছোট্ট করে। ভাবলাম সে না আবার তোমাদের ঈমান নষ্ট করার সুযোগ গ্রহণ করে।

তো যারা অন্যদের পথপ্রদর্শনের কাজ করেন তারা তো এমন কাজ থেকেও নিজেদের মুক্ত রাখার চেষ্টা করেন, যা দ্বারা মানুষের মনে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। আর এধরনের বুয়ুর্গণই পীর হিসেবে বরণ যোগ্য। আর যাদের বাহ্যিক অবস্থা শরীয়ত পরিপন্থী তাদের কতক তো মূলত ভণ্ড ও প্রতারণা। তাদের বাতেন ও ভিতরগত অবস্থাও শরীয়ত মুতাবেক নয়। এরা হল মরদুদ ও অভিশপ্ত শ্রেণীর লোক।

আর কতকের বাতেন ও ভিতরগত অবস্থা পূর্ণ শরীয়ত মুতাবেক কিন্তু যাহের ও বাহ্যিক অবস্থা আমাদের বোধ ও বুদ্ধির উর্ধে, তাই তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে না প্রশ্ন তোলার দরকার আছে, আর না তাদের অনুসরণ করার কোন প্রয়োজন আছে।

মোটকথা এমন ব্যক্তিকেই পীর হিসেবে গ্রহণ করা উচিত যার যাহের ও বাহ্যিক অবস্থা শরীয়ত মুতাবেক এবং বাতেন ও ভিতরগত অবস্থাও সম্পূর্ণ শরীয়ত মুতাবেক। সারকথা হল- কারো কাছেই নজরবাযি ও কুদৃষ্টি বৈধ হওয়ার কোন দলীল-প্রমাণ নেই। তাই কুদৃষ্টি ও নজরবাযি সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ।

কুদৃষ্টি যেমন হারাম তদ্রূপ মনের কুচিন্তাও হারাম

আয়তের পরবর্তী অংশে আল্লাহ তাআলা বলেন- **وَمَا تُخْفِي الصُّؤُورُ** অর্থাৎ যা কিছু মানুষ বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখে আল্লাহ তাআলা তাও জানেন। আর এটা প্রথমটার চেয়েও মারাত্মক। গোনাহ কেবল দৃষ্টির মাধ্যমেই হয় না; বরং অন্তর দ্বারাও গোনাহ হয়। বহু লোক মনে মনে শাশ্রুবিহীন সুদর্শন বালক ও সুন্দরী নারীদের নিয়ে কল্পনা করে। তাদেরকে নিয়ে ধ্যান ও কল্পনার রাজ্য নির্মাণ করে। তাদের ধ্যান-খেয়াল ও কল্পনা করে অবৈধ মজা লুটে। আর ভাবে আমি খুব পরহেযগার দীনদার নামাযী ইত্যাদি।

ভালভাবে বুঝে রাখুন, এ সবই সম্পূর্ণ শয়তানী ধোকা; বরং মনে মনে চিন্তা-ভাবনা ও পর্যালোচনা করার দ্বারা আরও বেশি ক্ষতি হয়। কারণ, কুদৃষ্টির সময় মাঝেমাঝে কুশ্রী

চেহারাও নজরে পড়ে তাতে দৃষ্টি আহত হয়, মন বিতৃষ্ণ হয়। কিন্তু মনে মনে জল্পনা কল্পনা করার দ্বারা অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে এবং অন্তর থেকে তা কখনও বের করা যায় না; বরং এ ক্ষেত্রে আরেকটি প্রবঞ্চনার শিকার হতে হয়, তা হল কুদৃষ্টি না করে কেবল মনে মনে জল্পনা কল্পনা করে ভাবতে থাকে যে, আমি বড় কাজের কাজ করেছি। দেখতে ইচ্ছে করছিল তারপরও দেখিনি। অথচ এদিকে লক্ষ করে না যে, আমি মনে মনে জল্পনা কল্পনা করে অবৈধ মজা লুটছি। মনে মনে যখন মজা লুটছ তখন বড় কাজের কাজ আর কোথেকে রইল। মোটকথা এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে যেন মনের মধ্যে কারো জল্পনা-কল্পনা ও ধ্যান-খেয়াল আসন গেড়ে না বসতে পারে।

কানের মাধ্যমে যেহেতু মনের মধ্যে এ ধরনের বিষয় প্রবেশ করে তাই চোখের মত কানকেও পাপময় কোন কিছু শোনা থেকে রক্ষা করতে হবে। এ ধরনের গাল-গল্প ও কথাবার্তা শোনা থেকে বিরত থাকবে। গান-বাজনা হয় এমন স্থানে যাতায়াতও করা যাবে না। কখনও স্বয়ং মন ও অন্তর দ্বারাই গোনাহ হয়, কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। যেমন পূর্বে দেখা কোন দৃশ্য মনে পড়া এবং তা থেকে মজা লাভ করা। তো এসব কিছু থেকেই বেঁচে থাকতে হবে। আরেকটি বিষয় যার দ্বারা বোঝা যায় যে, মনের গোনাহ অর্থাৎ খারাপ জল্পনা-কল্পনা কুদৃষ্টির গোনাহের চেয়েও ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক, আর তা হল- মনের জল্পনা কল্পনা এবং কুদৃষ্টির মাঝে একটি বড় পার্থক্যও আছে, পার্থক্যটি হল- চোখের গোনাহের ক্ষেত্রে তো অন্যরা দেখে ফেলে যদিও নিয়তের ব্যাপারে জানতে পারে না পক্ষান্তরে মনের জল্পনা কল্পনা কেউ দেখতে পায় না। তা আল্লাহ পাক ছাড়া কেউ জানতে পারে না। তাই এ গোনাহ থেকে সেই বাঁচতে পারবে যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে আর রোগ দূর করার তিনটি স্তর রয়েছে, এক. মনে চাহিদা ও কামনা জাগ্রত হওয়া এবং ঐ চাহিদা ও কামনা দমিয়ে রাখা দুই. মনের চাহিদা ও কামনাকে দুর্বল করে দেওয়া। তিন. যে বস্তুর কারণে মনে এই কামনা ও বাসনা সৃষ্টি হয়েছে তা মন থেকে বের করে দেওয়া।

মনের কামনা ও চাহিদা এবং জল্পনা ও কল্পনা দমন করার সহজ পথ

আর এই তিন স্তরের মধ্যে প্রথম স্তর তথা মনের চাহিদা দমন করা অর্থাৎ অন্তরে এর ধ্যান-খেয়াল আসন গেড়ে বসতে না দেওয়া তো একটি এখতিয়ারী ও ইচ্ছাধীন বিষয়। যদি আপনা আপনি সে দিকে চিন্তা ও খেয়াল ধাবিত হয় তাহলে তাকে ফেরান। কল্পনার লাগাম টেনে ধরুন। আর এর সহজ পথ হল- মনের মধ্যে যখন কোন রূপসী নারী ও কিংবা সুদর্শন বালকের প্রতি টান ও আকর্ষণ অনুভূত হয় তখন তার এলাজ ও প্রতিবিধান হল- তখন কোন কুশ্রী ও কদাকার চেহারার অধিকারী ব্যক্তির দিকে তাকানো। যদি সেখানে উপস্থিত এমন কাউকে না পাওয়া যায় তাহলে এভাবে কোন কুশ্রী চেহারা কল্পনা করা যে, যেন কাল কুশ্রী চেহারার একটি মানুষ দেখেছি, যার চেহারা বসন্তের দাগে ভরা, দু'টি চোখই দৃষ্টিহীন, অন্ধ, পুরো মাথা টাক, ঠোঁট বেয়ে পুরো মুখ থেকে লালা ঝরছে। দাঁতগুলো সামনের দিকে বেরিয়ে

আছে। নাক সম্পূর্ণ বোঁচা, আর তার নাক থেকে শ্লেথ্মা বরছে। ঠোঁটগুলো মোটা ও ফোলা ফোলা। ময়লা ও অপরিচ্ছন্নতার কারণে তার চারপাশে মাছি ভনভন করছে। এমন দৃশ্য কখনও না দেখে থাকলেও কল্পনা-শক্তি প্রয়োগ করে তৈরী করে নিবে। ইনশাআল্লাহ রূপবান ও রূপসীদের দেখার ফলে দিলের যে ক্ষতি হয়েছিল তা পূরণ হয়ে যাবে। পুনরায় যদি সেই রূপসী কিংবা রূপবানের চেহারা মনে পড়ে তাহলে একই ধ্যান ও কল্পনা করবে। যদি এই ধ্যান ও কল্পনা দ্বারা পুরোপুরি ফায়দা না হয় বরং বারবার সেই রূপসী ও রূপবানদের চেহারা মনে পড়ে তবুও ধ্যান ও কল্পনায় সেই বিকট দর্শন দৃশ্যকে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করা। তারপরও যদি কাজ না হয়; বরং বারবার সেই রূপসী ও রূপবানদের কথা মনে পড়ে হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয় তাহলে এই ধ্যান ও কল্পনা কর যে, এই সুদর্শন কিংবা প্রিয়দর্শিনী একদিন মরে যাবে, তখন তার স্থান হবে কবরে। সেখানে তার এই তুলতুলে দেহ পঁচে গলে শেষ হয়ে যাবে। তা পোকা-মাকড়ের খোরাক হবে। তবে এই ধ্যান-খেয়ালে কেবল তখনই ফায়দা হবে যখন তা মনের মধ্যে বদ্ধমূল করা হবে, তখন এই ধ্যান ও মোরাকাবা মন থেকে সুন্দর ও সুন্দরীদের জল্পনা-কল্পনা চিরতরে মিটিয়ে দেবে। তবে এর উপকারিতা এতটা স্থায়ী হবে না যে, এতে করে ভবিষ্যতে আর এ ধরনের জল্পনা-কল্পনা পয়দাই হবে না।

দ্বিতীয় স্তর : ভবিষ্যতেও এ ধরনের কামনা ও চাহিদা এবং জল্পনা-কল্পনা পয়দা না হওয়ার উপায়

ভবিষ্যতেও এ ধরনের কামনা ও চাহিদা পয়দা না হওয়ার চিকিৎসা হল একমাত্র ‘আল্লাহর যিকির’। তাই বেশি বেশি আল্লাহর যিকিরের অভ্যাস করুন।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ পাকের কঠিন শাস্তি ও আযাবের ধ্যান খেয়াল অন্তরে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করুন।

তৃতীয়ত, এই চিন্তা করুন যে, আল্লাহ পাক সব জানেন এবং আমার উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। তাই পালানোর কিংবা লুকানোর কোন পথ নেই। কিছু দিন নিয়মিত এই আমল করতে থাকলে একদিন এই চোর অন্তর থেকে পালিয়ে যাবে তবে এত তাড়াতাড়ি বের হবে না। তাই খুব তাড়াহুড়া করলে চলবে না। কারণ, এমন পুরাতন রোগ একদিন কিংবা এক সপ্তাহে সারবে না। এ প্রসঙ্গে সুলতান মাহমুদ গজনবীর ঘটনা মনে পড়ল। সুলতান যখন হিন্দুস্তানে আক্রমণ করলেন তখন এক সৈনিক মন্দিরে গিয়ে দেখল যে, এক ব্রাহ্মণ পূজা-অর্চনা করছে। সৈনিক তার উপর তরবারি উদ্যত করে বলল, কালেমা পড় নতুবা শেষ করে ফেলব। ব্রাহ্মণ বলল, জনাব! একটু ধৈর্য ধরুন। সৈনিকটি পুনরায় তাগাদা দিল কালেমা পড় নতুবা শেষ করে ফেলব। ব্রাহ্মণ বলল, জনাব! নব্বুই বছরের রাম তো অন্তর থেকে বের হতেও কিছুটা সময় লাগবে। এত সামান্যতেই কিভাবে বের হয়ে যাবে?

তো মনোবল হারানো চলবে না, অবিরাম চেষ্টা করে যেতে হবে তাহলে ধীরে ধীরে এই কামনা ও চাহিদা কমতে থাকবে এবং একদিন আপনার নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে।

আর অন্তরে খারাপ কামনা ও চাহিদার কোন স্থানই থাকবে না, যা আপনার আমার সকলের পরম কাম্য ও আরাধ্য।

তৃতীয় স্তর: অবৈধ কামনা ও চাহিদার উপাদান অন্তর থেকে চিরতরে নির্মূল হয়ে যাওয়া
তৃতীয় স্তর হল, ঐ উপাদানই নির্মূল হয়ে যাওয়া, যার দ্বারা কামনা ও চাহিদা পয়দা হয়। এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া যে, আর কামনা ও চাহিদাই পয়দা হয় না। এটি এমন একটি স্তর যাকে স্বল্প বুদ্ধির ধর্মপ্রাণ লোকেরাই কেবল মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মনে করে এবং তা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে হতাশ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ নিজের মধ্যে যখন কামনা ও বাসনার উপস্থিতি অনুভব করে তখন মনে করে যে, আমার সমস্ত মেহনত ও মোজাহাদা বুঝি বৃথা গেল। আল্লাহ পাকের যিকির-আযকার যা কিছু করেছি তার সবই ভেসে গেল, এমনকি অস্থিরতা ও পেরেশানীর কারণে তাদের যবান দিয়ে এমন কথাও বেরিয়ে যায় যা আল্লাহ পাকের শানে গোস্তাখী ও বেয়াদবী। যেমন, এতদিন যাবত মাওলাকে তালাশ করছি তবুও তিনি আমাদের প্রতি সামান্য সদয় দৃষ্টিপাত করছেন না! যেই বঞ্চিত সেই বঞ্চিতই রয়ে গেলাম! মনে রাখবেন, এটা শয়তানের মহাপ্রতারণা। শাহওয়াত ও কামভাব চিরতরে নির্মূল হয়ে যাওয়া এই স্তর কখনই কাম্য ও প্রার্থনীয় নয়। আর কামনা ও কামভাব যদি না-ই থাকে তখন গোনাহ থেকে বেঁচে থাকায় কোন কীর্তি ও কৃতিত্ব থাকে না। অন্ধ যদি এই বলে আত্মপ্রশংসা করে যে, আমি কখনো কুদৃষ্টি করি না তাহলে তা কখনই প্রশংসা ও সাধুবাদযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। সে কুদৃষ্টি করবে কিভাবে, কারণ দেখার উপকরণ ও মাধ্যমই তো তার নেই। নপংগুক বা পুরুষত্বহীন ব্যক্তি যদি দাবী করে যে, আমি পরনারীর সঙ্গে মেলামেশা করি না, তাহলে তা-ও কোন কীর্তি ও প্রশংসনীয় বিষয় বলে গণ্য হবে না; বরং কীর্তি ও কৃতিত্ব তো তখনই গণ্য হবে যখন সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আপন অন্তরকে তার অবৈধ কামনা ও চাহিদা থেকে ফিরিয়ে রাখবে। যার দু' প্রকারের এলাজ ও প্রতিবিধানই আমি বাতলে দিয়েছি। প্রথমটি তাৎক্ষণিক প্রতিবিধানে কার্যকর ভূমিকা রাখে এবং তার কোন প্রভাব প্রতিক্রিয়াই আর বাকি থাকতে দেয় না। দ্বিতীয়টি স্থায়ীভাবে কামনা ও বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

সারকথা হল- আমার উদ্দেশ্য হল এই ভয়াবহ গোনাহের ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করা। এই ভয়াবহ গোনাহ মানুষের মধ্যে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। যাদেরকে সমাজে নেককার, দ্বীনদার, পরহেয়গার ও দরবেশ মনে করা হয় তারাও এই মারাত্মক গোনাহে ফেঁসে আছে। আল্লাহর ওয়াস্তে এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। বড় আফসোসের কথা হল- মুখে আল্লাহ পাকের ইশক ও মহব্বতের দাবী অথচ নজর ও দৃষ্টি অন্যের প্রতি। এ প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ল- এক তরুণী পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল, রসপিয়াসু এক যুবক তার পিছু নিল। তরুণী বিষয়টি টের পেয়ে তাকে লক্ষ করে প্রশ্ন করল, তুমি কে? আমার পিছু নিয়েছ কেন? যুবকটি উত্তর দিল, আমি তোমার প্রেমিক ও দেওয়ানা হয়ে গেছি, এজন্য তোমার পিছু নিয়েছি। তরুণীটি তাকে পরীক্ষা করার জন্য বলল- আমার পেছনে আমার বোন

আসছে, সে আমার চেয়েও বেশি সুন্দরী ও আকর্ষণীয়। একথা শুনে যুবকটি পেছনে ফিরে বিপরীত দিকে হাঁটা শুরু করল। তার ইশক ও প্রেমের এই অবস্থা দেখে তরুণীটি তাকে এক দাবড়ানী দিয়ে বলল- আহা এই নিয়ে ইশক ও প্রেমের দাবী কর!

সুধীমগুলী! কিয়ামত দিবসে আল্লাহ পাক যদি তার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে কেবল এটুকু জিজ্ঞেস করে যে, আমাকে ছেড়ে তুমি অন্যের প্রতি তাকালে কেন? বলুন, তখন কী উত্তর দিবেন। এটা কোন হেলা-ফেলার বিষয় নয়, এর জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। এর আরেকটি মোক্ষম তদবীর ও ব্যবস্থা রয়েছে যা দ্বারা পূর্বের তদবীর ও ব্যবস্থাগুলো আরও জোরালো ও শক্তিশালী হবে, আর তা হল- মনে যখন এ ধরনের খেয়াল ও কল্পনা আসে তখন অযু করে দু' রাকাত নামায পড়ুন এবং তওবা করুন, আল্লাহ পাকের কাছে রোনাজারী করুন। তো যখনই মনে গোনাহের কামনা-বাসনা জাগে তখনই এই আমল করুন। এক দিন হয়ত অনেক রাকাত নামায পড়তে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় দিন খুব কমই এ ধরনের খেয়াল ও কল্পনা মনে আসবে। এভাবে ধীরে ধীরে এ ধরনের সব খেয়াল অন্তর থেকে বেরিয়ে যাবে। কারণ, নামায নফসের জন্য বড় কঠিন কাজ। সে যখন দেখবে যে, সামান্য মজা লাভের বিনিময়ে এমন মহামুসিবত এসে পড়ে যে, তাকে সারা দিন নামাযেই পড়ে থাকতে হয়, তখন দেখবেন এ ধরনের ওয়াসওয়াসা ও খারাপ খেয়াল মনে আসাই বন্ধ হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ ধরনের গোনাহের মুসিবত থেকে হেফাজত করুন। আমীন।